স্মরণ

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার পরবর্তী সময়ে আমরা হারিয়েছি দেশ ও বিদেশের অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বকে; এই সময়কালের মধ্যে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন অনেক সহকর্মী বন্ধু। তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

অধ্যাপক	কৌশিক দাস	—	শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী কলেজ
,,	উৎপল রায়	—	কাটোয়া কলেজ
,,	প্রত্যয়ানন্দ দাস	—	বঙ্গবাসী কলেজ
,,	মহম্মদ হানিফ	—	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
,,	অশোক মুখোপাধ্যায়	—	খড়গপুর কলেজ
,,	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	—	বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর
,,	রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার	—	প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	অমরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী	—	গুরুদাস কলেজ
,,	দেবীপ্রসাদ নন্দ	—	বসিরহাট কলেজ
,,	কৌশিক মল্লিক	—	রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র কলেজ, কান্দি
,,	শ্যামাপ্রসাদ সিংহ রায়	—	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ
,,	অনিরুদ্ধ রায়	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	মঞ্জুলিকা বসু	—	বহরমপুর গার্লস কলেজ
,,	অরুণকুমার ভৌমিক	—	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,,	জগদিন্দুনারায়ণ ভট্টাচার্য	—	জয়পুরিয়া কলেজ
,,	তীর্থঙ্কর মুখার্জী	—	সিটি কলেজ
,,	উমা উপাধ্যায়	—	পি. ডি. উইমেন্স কলেজ
,,	রমাপ্রসাদ দে	—	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
,,	হরমোহন মুখোপাধ্যায়	—	আনন্দমোহন কলেজ
,,	সুজিত কর	—	মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ
,,	পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	—	ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ (দিবা)
,,	বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	—	গৌরমোহন শচীন মন্ডল মহাবিদ্যালয়
,,	রামপদ মিশ্র	—	কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ
,,	দেবাশীষ চ্যাটার্জী	—	সাউথ ক্যালকাটা ল'কলেজ
,,	প্রণব কুমার ঘোষ	—	শ্রী গোপাল ব্যানার্জী কলেজ
,,	সব্যসাচী ভট্টাচার্য	—	প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী
,,	সুজল সরকার	—	কাঁথি প্রভাত কুমার কলেজ
,,	অশোকজীবন বসু	—	বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ
,,	সুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী	—	রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
,,	যুগল কিশোর মান্না	—	কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ
,,	তপনকুমার মল্লিক	—	কামারপুকুর কলেজ
,,	মৃন্ময় পাল	—	প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাবিদ্যালয়
..	জলদবরণ রায়	—	বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়
,,	গৌরীপদ ভট্টাচার্য	—	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

,,	দীপক কুমার বসু	—	বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ
,,	অমলকৃষ্ণ রায়	—	হেরম্বচন্দ্র কলেজ
,,	রমাকান্ত চক্রবর্তী	—	বিদ্যাসাগর কলেজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন সম্পাদক, এশিয়াটিক সোসাইটি
,,	ফাল্গুনী চক্রবর্তী	—	বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
,,	সুশীল চৌধুরী	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	প্রলয় দেব	—	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,,	অশ্রুকুমার শিকদার	—	উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
,,	কনকরঞ্জন সমাদ্দার	—	কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
,,	করুণাপ্রসাদ রায়চৌধুরী	—	স্কটিশচার্চ কলেজ
,,	দেশরঞ্জন চক্রবর্তী	—	পি. এন. দাস কলেজ, পলতা কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য
,,	সত্যব্রত পাহাড়ী	—	বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
,,	লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য	—	ফকিরচাঁদ কলেজ
,,	সতীশচন্দ্র মহাপাত্র	—	বঙ্গবাসী কলেজ, কর্মসমিতির প্রাক্তন সদস্য, WBCURTWA-র সাধারণ সম্পদক
,,	সুধীর রায়	—	বর্ধমান রাজ কলেজ, প্রাক্তন সভাপতি, AIFUCTO
,,	নুপূর ঘোষ	—	যোগমায়া দেবী কলেজ
,,	অপর্ণা দাশগুপ্ত	—	মুরলীধর গার্লস কলেজ
,,	রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	—	রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া
,,	দেবকুমার বসু	—	প্রাক্তন অধ্যাপক, ISI,
,,	আশিষ দাশগুপ্ত	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	সুনন্দা দাশগুপ্ত	—	মুরলীধর গার্লস কলেজ
,,	রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী	—	আনন্দমোহন কলেজ
,,	মুহম্মদ কামারুজ্জামান	—	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বসিরহাট কলেজ
,,	রামলাল রায়	—	প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বসিরহাট কলেজ
,,	অলোক রায়	—	প্রাক্তন অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ কলেজ
,,	প্রবীর সরকার	—	বিবেকানন্দ কলেজ
,,	দুলালেন্দু চ্যাটার্জী	—	সুরেন্দ্রনাথ আইন কলেজ
,,	দিলীপকুমার বসু	—	বর্ধমান ও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য
,,	মিলি মহলানবীশ	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	কল্যাণকুমার চ্যাটার্জী	—	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
,,	সুদক্ষিণা বন্দ্যোপাধ্যায়	—	দেশবন্ধু কলেজ ফর গার্লস, কলকাতা
,,	নুপূর দেবনাথ	—	গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়
,,	বিজয়লক্ষ্মী মুখার্জী	—	প্রাক্তন অধ্যক্ষা, বাসন্তীদেবী কলেজ
,,	অঞ্জলি দাস	—	চারুচন্দ্র কলেজ
,,	সুধীরকুমার ঘোষ	—	বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,,	মুশিরুল হাসান	—	ঐতিহাসিক, প্রাক্তন উপাচার্য, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া
,,	অজিত কুমার দেবনাথ	—	গৌরমোহন শচীন মণ্ডল মহাবিদ্যালয়
,,	শ্যামল রায়	—	শ্রীপৎ সিং কলেজ
,,	মেরী সরকার	—	বহরমপুর গার্লস কলেজ

,,	দিলীপ কুমার নন্দী	—	বঙ্কিম সর্দার কলেজ
,,	হারীত ভট্টাচার্য্য	—	সিটি কলেজ
,,	মণিলাল খান	—	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
,,	কার্তিক চন্দ্র অধিকারী	—	বিদ্যানগর কলেজ
,,	শাঁওলি বসু	—	বিদ্যানগর কলেজ
	নবনীতা দেব সেন	—	অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক
,,	সাজাহান আলি মোল্লা	—	সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ
	নিরুপম সেন	—	প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
	দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়	—	সঙ্গীতশিল্পী
	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	—	কবি
	মৃণাল সেন	—	চিত্র পরিচালক
	কাদের খান	—	অভিনেতা
	দিব্যেন্দু পালিত	—	সাহিত্যিক
	পিনাকী ঠাকুর	—	কবি
	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	—	সাহিত্যিক
	অমর পাল	—	লোকসঙ্গীতশিল্পী
	অদ্রীশ বর্ধন	—	সাহিত্যিক
	গিরিশ কারনাড	—	বিশিষ্ট অভিনেতা ও নির্দেশক
	সন্তোষ রাণা	—	সমাজকর্মী
	স্বরূপ দত্ত	—	অভিনেতা
	শীলা দীক্ষিত	—	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লী
	জগন্নাথ মিশ্র	—	প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিহার
	জর্জ ফার্নান্ডেজ	—	প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী
	এস. জয়পাল রেড্ডী	—	প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
	সুষমা স্বরাজ	—	প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
	অরুণ জেটলী	—	প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
	ড. ইউ. আর রাও	—	প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক
	অধ্যাপক যশপাল	—	বৈজ্ঞানিক
	শ্রী খৈয়াম	—	যন্ত্রশিল্পী
	টনি মরিসন	—	নোবেলজয়ী সাহিত্যিক
	আবুল হাসনাথ খান	—	প্রাক্তন বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ
	রাইচরণ মাঝি	—	প্রাক্তন বিধায়ক, পশ্চিমবঙ্গ
	গুরুদাস দাশগুপ্ত	—	প্রাক্তন সাংসদ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা

"এছাড়া বিভিন্ন দুর্ঘটনায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে হত মানুষ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে নিহত শিক্ষক ও সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন গণ আন্দোলনের শহীদ এবং সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত শহীদ জওয়ানদের স্মৃতির প্রতি রইল আমাদের শ্রদ্ধা।"

ভূমিকা

মাননীয় সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত অধ্যাপক সমিতির প্রাক্তন ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ, আজীবন সদস্য/সদস্যাগণ এবং সহযোগী সহযোদ্ধা বন্ধুগণ, শুরুতেই আপনাদের সকলকে সমিতির ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই। আপনারা বরাবরের মতো এবারেও আপনাদের মূল্যবান আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে এই রিপোর্টকে আরো সমৃদ্ধ করবেন এই বিশ্বাস রাখি। গত এক বছরে সমিতির আজীবন সদস্য সহ বর্তমান সদস্য বন্ধু যাঁদের আমরা হারিয়েছি তাঁদের প্রত্যেককে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি :

এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আমাদের প্রিয় সমিতির ৯৩তম বার্ষিক সম্মেলনে মিলিত হচ্ছি। সভ্যতার নিত্য নতুন সংকটে বিপন্ন গোটা দুনিয়া। সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের করাল ছায়া ঢেকে ফেলতে চাইছে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি সবকিছু। জাতি-ধর্ম-বর্ণবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদ, 'মুক্ত অর্থনীতি' লালিত ভোগবাদী কৃষ্টি, ক্রমবর্ধমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য - এ সবকিছুই গণতন্ত্র ও সামাজিক - মানবিক মূল্যবোধগুলির কণ্ঠরোধ করতে চাইছে।

বেশ কিছু সময় ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন-এর মধ্যে পারস্পরিক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে যে শুল্ক বাড়ানোর প্রতিযোগিতা চলছিল তা গোটা পৃথিবীর অর্থনীতিকে বেসামাল করে দেয়। মার্কিন এই নীতি ভারতের ক্ষেত্রেও লাগু হওয়ায় ভারতও তাতে প্রত্যুত্তর করে। সাম্প্রতিকতম G20 সম্মেলনে এই বিষয়ে কিছু সদর্থক আলোচনা হলেও পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত ঘোষণায় আমেরিকা স্বাক্ষর না করায় পূর্ববর্তী Paris Agreement নিরর্থক হতে চলেছে। যদিও এই সম্মেলন থেকে ২০৫০-এর মধ্যে সমুদ্রের প্লাস্টিক বর্জ্য শোধনের প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে।

গভীর নিরাপত্তাহীনতা এবং বঞ্চনার এই পরিমণ্ডলে দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিবাদী এবং স্বৈরাচারী শক্তিসমূহের উত্থান লক্ষ করছি আমরা। পরিহাসের বিষয় এই যে, এই শক্তিগুলি ক্রমবর্ধমান অসাম্য ও নিরাপত্তাহীনতার জন্য নয়া-উদারবাদী নীতিগুলোর বদলে সংখ্যালঘু এবং অভিবাসীদের ওপর দায় চাপিয়েছে। এই শক্তিগুলি একদিকে 'জাতীয়তাবাদ'-এর নাম করে 'জেনোফোবিয়া' উসকে দিয়ে এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে নাটকীয় নির্বাচনী সাফল্যও অর্জন করেছে।

দেশে দেশে আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি ফ্যাসিবাদ-স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক সংগঠিত বর্ণবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক হিংসা, নাগরিক স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আক্রমণ; নারীদের অধিকার ও নারীবাদী সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মসূচীর উপর আক্রমণ; মিথ্যা সংবাদ প্রচারের মধ্যে দিয়ে ধর্ম-জাতি- সম্প্রদায়গত ঘৃণা ও বিদ্বেষকে উসকিয়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে একক শক্তিশালী নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী আস্ফালন ও রাজনীতি-এর সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত। ফ্যাসিবাদী রাজনীতির এই বাড়বাড়ন্তের অপরাপর দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফ্রান্সে মারি ল পেনে-এর ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের সফল ব্রেক্সিট ভোট এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাম্প্রতিকতম নির্বাচনের ফলাফল।

দেশে-বিদেশে সব ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তি সন্ত্রাসবাদের মারণখেলায় মেতে উঠে তছনছ করে দিতে চাইছে। সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত করছে শান্তি ও সম্প্রীতির বাতাবরণ। আর এই দুনিয়াজোড়া সন্ত্রাসের বারুদগন্ধে ভারী হয়ে ওঠা সময়ে ভেঙ্গে পড়ছে বিশ্বাস-মৈত্রী-সংহতি-মনুষ্যত্বের বহুদিনের সব মহামূল্যবান মাইলফলক।

আমাদের দেশে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর মোদী সরকার তার বিদেশনীতিতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আনেনি। বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের সমতা রাখার চেষ্টা হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইজরায়েল-এর দিকে ঝুঁকে

থাকার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ-চীন-ভারত-বর্মা আর্থিক করিডর-এর নতুন করে উন্নতি করার চেষ্টা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রথমবারের জন্য প্যালেস্টাইন-এর স্বার্থের বিরুদ্ধে ভোটদান উল্লেখের দাবি রাখে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মোকাবিলার নামে নয়া উদারবাদী সরকারগুলি একদিকে কর্পোরেটদের জন্য 'বেল আউট' আর অন্যদিকে জনসাধারণের জন্য ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি বেকারি, জীবনধারণের পরিস্থিতির অবনতি ও বিপন্নতা ক্রমেই অসাম্যকে তীব্রতর করে তুলেছে।

ভয়াবহ বেকারি ও কর্মসংকোচন, রাফাল সহ নানা আর্থিক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, ব্যাঙ্কিং সেক্টরে ঋণ-কেলেঙ্কারি তথা নানা প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতি, ভারতীয় মুদ্রার পতন, পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর অগ্নিমূল্য, কৃষকদের ফসলের দাম না পাওয়া এবং আত্মহনন, অটোমোবাইল সহ সমস্ত শিল্পে শোচনীয় মন্দা - সবকিছু নিয়ে অর্থনীতির বিপর্যস্ত অবস্থা, নারী-নির্যাতন, হিন্দুত্বের আগ্রাসী জিগির তুলে সংখ্যালঘু-নির্যাতন, তৎসহ দলিত-নির্যাতন মানুষকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। বর্তমান ভারতে প্রায় নিয়মিত হয়ে চলেছে। লাভজনক সংস্থাগুলিকে বিলগ্নীকরণের বিষয়টি বহুসংখ্যক মানুষকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাম গণতান্ত্রিক - ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি সহ সকল প্রকার বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করার ফলে গণতন্ত্রের সামনে একটি বড় প্রশ্ন চিহ্ন এসে গেছে। 'এক দেশ এক দল', 'এক দেশ এক ভাষা'-র মতো শ্লোগান তুলে ভারতের দীর্ঘলালিত 'নানা ভাষা নানা মত'-এর বৈচিত্র্যমণ্ডিত সংহতির বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র দিনে দিনে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

অসমে এন.আর.সি-র নামে ১৯ লক্ষ মানুষকে বিপন্ন করে তোলা এবং দেশ জুড়ে এন.আর.সি-র নামে এক ভয়ের বাতাবরণ গড়ে মানুষকে অস্তিত্বের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে। ভারতবর্ষে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পরেও শুধুমাত্র উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বিদেশী বা 'ডি' ভোটারের তালিকায় নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং এদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই তালিকায় বাদ যায়নি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং সেনা জওয়ানদের পরিবারের সদস্যরাও।

পশ্চিমবঙ্গে এন.আর.সি চালু করার অপপ্রচারে আতঙ্কিত হয়ে ইতিমধ্যে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ গরীব মানুষের মধ্যে যেভাবে এন.আর.সি ভীতি সৃষ্টি হয়েছে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে এন.আর.সি নামে মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াকে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সর্বত্র ভাবে এন.আর.সি বিরোধিতা করতে হবে।

জঙ্গী আক্রমণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'সার্জিকাল স্ট্রাইক' এবং দেশপ্রেমের ঢাক পিটিয়ে নির্বাচনী সাফল্য- হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডাকে উসকিয়ে ভোটের মেরুকরণ - যুদ্ধ যুদ্ধ রব তুলে অন্য সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকার চাতুরী এখন কেন্দ্রীয় সরকারের এক নিয়মিত বিষয় হয়ে উঠেছে।

তড়িঘড়ি কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা লোপ ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যকে একাধিক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করে কাশ্মীর উপত্যকাকে সামরিক নিরাপত্তায় মুড়ে তাকে কার্যত দেশ ও দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে বিরোধী নেতৃত্বকে গৃহবন্দী/ কারাবন্দী করে রাখার মাধ্যমে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা গণতন্ত্রকে আবারও এক সংকটের মুখে দাঁড় করে দিয়েছে। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মার্কিনমুলুকে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক, সর্বকালের সেরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে ট্রাম্পকে নিয়ে উচ্ছ্বাস এবং পরবর্তীতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পছন্দমতো বাছাই করা এম.পি-দের নিয়ে এসে তাদের কাশ্মীর ঘোরানোতে প্রশাসনের দীনতাই প্রকাশ করছে। অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ৫ শ্রমিক যেভাবে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দা ও লজ্জার।

শিক্ষা প্রসঙ্গে

৯২-তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে দেশের এবং রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। উল্লেখ করা হয়েছিল বিপদের দিকগুলি। গত এক বছরে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। পক্ষান্তরে নতুন করে আক্রমণ নেমে এসেছে উচ্চশিক্ষায়— কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়স্তরেই চিত্র একই। দেশের এবং রাজ্যের অধ্যাপক সংগঠনগুলি আজ এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করাই বর্তমানে অধ্যাপক সংগঠনগুলির প্রধান কাজ।

সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত: উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং কেন্দ্রীকরণ ক্রমবর্ধমান। দেশে এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভাবনার সংকুচিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনো গণতান্ত্রিক বাতাবরণ নেই, মতের অমিল হলেই শারীরিক আক্রমণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অধ্যাপকদের। আলোচ্য সময়কাল দেশের এবং রাজ্যের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান বিপজ্জনক বিষয়গুলিকে পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৯) :

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে রাষ্ট্র-ভাবনার প্রকাশ ঘটে সেই রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত শিক্ষানীতির মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে 'Draft National Education Policy, 2019'-এর আগে দেশবাসী ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬ সালের দুটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রত্যক্ষ করেছেন। আশা-নিরাশার দোলাচলে ভারতবাসী প্রত্যাশা করেছিলেন প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতি বিগত বছরগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি সমস্যা উত্তরণের নির্দিষ্ট দিক-নির্দেশ সহ সম্ভাবনাগুলি বাস্তবায়নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবে। দেশবাসী আরও আশা করেছিলেন এই নয়া শিক্ষানীতি সাংবিধানিক নির্দেশ অনুযায়ী একটি বাস্তবসম্মত, সুবিন্যস্ত, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিসর রচনা করবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় প্রস্তাবিত এই নতুন শিক্ষানীতিতে বিবেচিত হয়নি ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো, উপেক্ষিত হয়েছে নাগরিক মূল্যবোধ, আলোচিত হয়নি অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে ক্রমবর্ধমান স্কুলছুটের বাস্তব সমস্যা, অভাব রয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার। ফলতঃ সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ ক্রমশ সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষার মূলস্রোত থেকে, এই বিপদ সম্পর্কেও প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি একেবারেই নীরব। এই শিক্ষানীতি কেন্দ্র সরকার পরিচালিত/ পোষিত প্রাথমিক ও পূর্ব-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ বা সংযুক্তিকরণের কথা বললেও শিশু মন্দির, একলব্য বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলির বিকাশের পথ প্রশস্ত করে ধর্মীয় পঠন-পাঠনকেই প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু করতে তুলতে বদ্ধপরিকর। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে মিউনিসিপ্যাল স্কুলগুলিকে কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে, উৎসাহিত করা হয়েছে সমাজের উচ্চবিত্তদের বিদ্যালয়ের পরিবর্তে তাদের সন্তান-সন্ততির জন্য গৃহশিক্ষককে বেছে নিতে। 'National Literacy Mission', 'Right to Education Act (RTEA)', এবং 'National Curricular Framework 2005' (NCF) ইত্যাদির যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়নি প্রস্তাবিত নয়া শিক্ষানীতিতে। স্বাভাবিকভাবেই এই শিক্ষানীতি শিক্ষার অধিকার আইনকে লঘু করে প্রসারিত করতে চাইছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারী উদ্যোগকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণের সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন জাতীয় এই শিক্ষানীতিতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের 'গড় নথিভুক্তির অনুপাত' (Gross Enrolment Ratio / GER) হবে ৫০%। নির্দিষ্ট সময়ে এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বহুমুখী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করলেও প্রস্তাবিত GER-এর প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যয় বরাদ্দের কোনো উল্লেখ এখানে নেই। প্রকৃতপক্ষে এসবই করা হয়েছে নীতি আয়োগের বিধান অনুযায়ী।

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে এও উল্লেখিত হয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-নগরীতে অসংখ্য বহুমুখী দক্ষ কর্মীর চাহিদা রয়েছে যা যোগান দেওয়া বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে অসম্ভব। এমতাবস্থায় একমাত্র প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বাস্তবায়নের সাহায্যেই বহুমুখী দক্ষ কর্মীর যোগান সুনিশ্চিত করা সম্ভব। নতুন শিক্ষানীতি প্রবর্তনে কাজ হারাবেন প্রচুর একমুখী দক্ষ কর্মী এবং সময়ের গর্ভে হারিয়ে যাবে বহু একমুখী স্বনামধন্য বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রস্তাবিত জাতীয় এই শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় বেসরকারি বিনিয়োগের পক্ষে সওয়াল করে ঘোষণা করেছে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই শর্ত অনুযায়ী মূল্যায়িত হবে। এই আইনে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে 'Corporate Philanthrophy', 'Corporate Social Responsibility' (CSR), 'Capital Market'-এর সাহায্য নেবার কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, বেসরকারি অর্থে প্রস্তাবিত উন্নয়নের পরিমণ্ডলে চাকুরীর নিরাপত্তা যে বহুলাংশে হ্রাস পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। নয়া এই শিক্ষানীতি অনুমোদিত মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নয়নের পরিবর্তে সেগুলি বন্ধ করার সুপারিশ করেছে।

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতির অত্যন্ত উদ্বেগজনক একটি দিক হলো—শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রকে সমগুরুত্ব না দেওয়া। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল মূলতঃ শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভাবনাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার জন্য। এতদিন পর্যন্ত রাজ্যগুলি নিজেদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষানীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। এই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেন্দ্রের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে এই শিক্ষানীতিতে। প্রস্তাবিত 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' (National Education Commission / NEC / RSA) নামক একটি সর্বশক্তিমান কমিটি গড়ার প্রস্তাবও রয়েছে এখানে এবং এই কমিটির সভাপতি হবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলিকে এই RSA-এর অধীনস্থ অংশ হিসাবে কাজ করতে হবে, যা ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণার এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের প্রতি চূড়ান্ত অবমাননাকর।

নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে জোর দিয়ে বারংবার বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষায় 'ডিজিটাল টেকনোলজি'র অধিক ব্যবহারের কথা। যদিও আমাদের দেশ অপেক্ষা উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষায় 'ডিজিটাল টেকনোলজি'র ব্যবহার নিয়ে এত হৈচৈ হয় না। সাম্প্রতিকতম গবেষণায় অনলাইন দূরশিক্ষার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ গবেষণালব্ধ এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রস্তাবিত খসড়ায় 'ব্যাপক মুক্ত অনলাইন শিক্ষাক্রম' (Massive Open Online Courses / MOOCS)-এর সুপারিশ করা হয়েছে। আলোচ্য খসড়ায় 'ব্যাপক মুক্ত অনলাইন শিক্ষাক্রম' প্রথাগত শিক্ষাক্রমের সহায়ক হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আগামী দিনে নতুন এই শিক্ষাক্রম যদি শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে তবে উচ্চাশিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস পাবে, অন্যদিকে তেমন উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই ছাত্র-ছাত্রী অন্তর্ভুক্তির (Students' Enrolment) পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সংকুচিত হবে চিরতরে।

রাষ্ট্রের উদ্যোগে বেসরকারি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য সওয়াল করতে গিয়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায় এবং গণতান্ত্রিক পরিসরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। মুক্ত এবং অনুসন্ধিৎসামূলক চিন্তা চেতনার বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এই প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতি। এই শিক্ষানীতিতে বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বৈদিক শিক্ষার উল্লেখ এবং অনুকরণের কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয়করণের অনেকগুলি প্রবণতা রয়েছে এই প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে। 'জাতীয় গবেষণা পরিষদ' (National Research Foundation / NRF) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রস্তাবিত এই পরিষদই ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত গবেষণার অর্থ সরবরাহ করবে। এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে ফলাফল ভিত্তিক (Outcome Based) মডেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেটি রেগন আমলের বহু সমালোচিত নিয়ন্ত্রক কাঠামো হিসেবেই সারা বিশ্বে নিন্দিত হয়েছে। এই মডেল নামমাত্র অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর যান্ত্রিকভাবে

আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। শিক্ষার বহুমুখী সমস্যার একমুখী সমাধান প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান সীমাবদ্ধতা।

অতি দীর্ঘ নয়া এই শিক্ষানীতি শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ ব্যয় বরাদ্দের কথা ঘোষণা করলেও, এই ব্যয় বরাদ্দের দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দেয়নি। পক্ষান্তরে সযত্নে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবে ব্যয় বরাদ্দের দিক নির্দেশ না থাকলেও আশা করা হয়েছে সময়ের সাথে সাথে এই খসড়ার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়িত হবে। আলোচ্য প্রস্তাবের মুখবন্ধে বলা হয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দের বিষয়টিকে প্রস্তাবের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এখানে আরো বলা হয়েছে যে শিক্ষার উন্নতিকল্পে যে অর্থের প্রয়োজন দ্রুত সে অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। পরবর্তী এক দশকে প্রস্তাবটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তার একটি প্রাথমিক হিসাব এখানে করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপের কথাও যুক্ত করা হয়েছে এখানে। যদিও বিষয় দুটিকে প্রস্তাবের অংশ আকারে বিবেচনা না করে কেবলমাত্র প্রস্তাবের নির্দেশিকা হিসাবে দেখবার নির্দেশ আরোপিত হয়েছে। এ-কথা বলা যেতে পারে, এই প্রস্তাবের গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুবই কম। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দের কোনো নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ এই প্রস্তাবে না থাকায় বিষয়টিকে সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং বদ্যানতার উপর ছেড়ে রাখা হয়েছে। নয়া এই শিক্ষানীতিকে একটি সরকারি নির্দেশিকা হিসেবে দেখাই ভালো, এখানে অবশ্য সরকারের করণীয় কোনো কাজেরই উল্লেখ নেই। প্রস্তাবিত সুদীর্ঘ এই শিক্ষানীতিকে বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা এই পর্যায়ভুক্তিকরণের সাহায্যে আমরা এই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

বিদ্যালয় শিক্ষা ঃ ভারতবর্ষের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.২৪%, যা অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। প্রস্তাবিত 'খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি' (Draft National Education Policy / DNEP) 'জাতীয় সাক্ষরতা আয়োগ' (National Literacy Mission / NLM)-এর সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা এবং সমাধানের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করেই সাক্ষরতার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করেছে, সেটি চূড়ান্ত অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক। এই প্রস্তাবে সাক্ষরতার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থান, শ্রেণী, সম্প্রদায় ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রাখা হয়নি, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। এই DNEP-তে উল্লেখ করা হয়েছে ৮৫% বেশি মস্তিষ্কের বিকাশ সম্পন্ন হয় ছয় বছর বয়সের মধ্যেই এবং মস্তিষ্কের বিকাশ সামগ্রিকভাবে শারীরিক পুষ্টির উপরই নির্ভরশীল। প্রসঙ্গক্রমে যে বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল সারা বিশ্বে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুর সংখ্যা ভারতবর্ষেই সর্বাধিক (৪৬.৬%)। পরিতাপের বিষয় এমন জ্বলন্ত সমস্যাও DNEP-তে উল্লেখিত হয়নি, উল্লেখিত হয়নি 'মিড-ডে মিল প্রকল্প'-এর বর্তমান সমস্যা সহ এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কথা। DNEP-র প্রথম অধ্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত নিন্দনীয়ভাবে শিশু অপুষ্টি দূরীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে কোনো সরকারি উদ্যোগের কথা ঘোষণা না করে এই খসড়া প্রস্তাবে শিশুশিক্ষা প্রসারে যে যুক্তির অবতারণা করেছে তা কেবল অবাস্তব নয়, অন্তঃসারশূন্যও বটে।

ভাষাশিক্ষা জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক শর্ত একথা যেমন সত্য, তেমনি প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত একথাও পরীক্ষিত সত্য। স্বাভাবিক নিয়মেই DNEP-তে প্রাথমিকস্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষার প্রস্তাব কার্যত তাই ভারসাম্যহীন এবং অবাস্তব। এই ভারসাম্যহীন, অবাস্তব প্রস্তাব কার্যকর হলে তা শিশুসমাজের উপর কতটা অতিরিক্ত চাপ তৈরি করবে তা সহজেই অনুমেয়। তৃতীয় কোনো ভাষা অবশ্যই মাধ্যমিকস্তর থেকে শেখানো যেতে পারে। বর্তমানে সারাদেশে বিজ্ঞান পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে কমছে মূলতঃ উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক, উপযুক্ত পরিকাঠামো (আদর্শ গবেষণাগার, প্রয়োজনীয় উপাদান, উপযুক্ত এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি), ভারতীয় ভাষায় ভালো পাঠ্যপুস্তক এবং সরকারী অনুদানের অভাবে। এই খসড়া প্রস্তাবে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলিকে চিহ্নিতকরণ এবং চিহ্নিত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কোনো শব্দই ব্যবহৃত হয়নি। বিদ্যালয়স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার নিম্নমুখী ধারাকে প্রতিহত করার পরিবর্তে এই

প্রস্তাবে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে তীব্র বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে বিজ্ঞানমনস্কতার উপর। জনসাধারণের বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির চেষ্টা না করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে আসীন আধিকারিকরা সুপরিকল্পিতভাবে অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে প্রসারিত করতে তৎপর। মজার কথা, প্রস্তাবিত এই DNEP বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার উপর বিদ্বেষপূর্ণ আক্রমণের মতো বিপজ্জনক বিষয়টিও এড়িয়ে গেছে সচেতনভাবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশের বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় বর্তমানে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয় বা সরকারি অনুদানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ক্রমশ মানুষের অপছন্দের তালিকায় চলে যাচ্ছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া সরকারি বিদ্যালয় বা সরকারি অনুদানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে যথাযথভাবে 'শিক্ষার অধিকার আইন' লাগু করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। এমতাবস্থায় সরকারি বিদ্যালয় বা সরকারি অনুদানে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির দুর্বলতা দূরীকরণের কোনো সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের পরিবর্তে DNEP-তে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় 'Public Private Partnership' (PPP) মডেল প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। DNEP-তে 'School Rationalisation'-এর কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে 'School Rationalisation'-এর মাধ্যমে ৫০-এর কম ছাত্র-ছাত্রী বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিকে সংযুক্তিকরণের। প্রস্তাবের পাশাপাশি DNEP-তে প্রতি ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব দুটি কার্যকর হলে প্রধানত ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রান্তিক অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা। বিদ্যালয় সংযুক্তিকরণের ফলে প্রান্তিক অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতিতে স্কুলছুটের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থনৈতিক এবং শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা। অর্থনৈতিক ও শারীরিক অক্ষমতা এক্ষেত্রেও সংকুচিত করবে শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে, অতএব প্রস্তাব দুটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'শিক্ষার অধিকার আইন' সংশোধনের মাধ্যমে এই DNEP অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য ২৫% সংরক্ষণের নীতি প্রত্যাহারেরও প্রস্তাব করেছে।

প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি বিদ্যালয় বহুমুখীতার উল্লেখ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের - গুরুকুল, মাদ্রাসা, গৃহবিদ্যালয়, ধর্মশিক্ষা বিদ্যালয় - অবতারণা করেছে। এই নীতি এও দাবি করে যে, এই বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়গুলি সরকারি অথবা সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা দূরীকরণে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। আমাদের আশঙ্কা এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার বেসরকারীকরণের পথে রাষ্ট্র ব্যবস্থা আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, বিদ্যালয় বহুমুখীতার ধারণাটি 'Curricular Frame Work' (NCF)-এর প্রস্তাবিত 'Equal Outcomes'-এর পরিপন্থী এবং অবাস্তব। শিক্ষার অধিকার আইনকে অর্থবহ করবার জন্য অপরিহার্য একটি ন্যূনতম মান নির্ণায়ক মানদণ্ডের প্রস্তাবও অনুপস্থিত এই খসড়া প্রস্তাবে যা প্রকারান্তে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করবে শিক্ষা বিপণীতে বিনিয়োগে। 'National Tutor Programme' (NTP) এবং 'Remedial Institutional Aids Programme'-এই দুটি কার্যক্রমের প্রস্তাব বর্তমান এই DNEP-তে বর্তমান। NTP-এর উদ্দেশ্য হল শ্রেণীর সবচেয়ে ভালো ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষিতদের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক রূপে উপস্থাপন করা। কিন্তু পঠন-পাঠনে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বলতা কাটিয়ে তুলতে প্রয়োজন অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তা এবং পরামর্শ, যা বন্ধু-শিক্ষকদের (Peer Tutor) দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। অন্যদিকে শ্রেণীর পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের দুর্বলতা মুক্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই RIAP-এর উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে শ্রেণীকক্ষের দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের চিহ্নিতকরণ তাদের উপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থায় অভিভাবকদের ভূমিকা সর্বকালে স্বীকৃত হলেও এই খসড়া অনুযায়ী অভিভাবকমণ্ডলী কর্তৃক শিক্ষকদের মূল্যায়নের প্রস্তাবটি কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। অভিভাবকমণ্ডলী কর্তৃক শিক্ষকদের মূল্যায়নে বহুক্ষেত্রেই নানান সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি পর্ষদ পরিচালিত পরীক্ষার পরিবর্তে

'National Testing Agency' (NTA) পরিচালিত পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। এই সুপারিশ অপ্রথাগত শিক্ষা বিপণীর উন্মুক্ত ক্ষেত্র রচনার মাধ্যমে অভিভাবক সম্প্রদায়ের উপর অতিরিক্ত আর্থিক দায়ের বোঝা চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

প্রস্তাবিত এই খসড়ায় মূল্যবোধের শিক্ষা (Value Education) বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি। গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি এমন কিছু উপাদানকে গ্রহণ করেছে যা পক্ষান্তরে ভারতীয় সংবিধানকেই আঘাত করে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারাকে কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের দর্শন, যোগ, গণিত, সাহিত্য এবং রাজনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি মূল্যবোধের শিক্ষা বলতে এই প্রস্তাবে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্যবাদকেই নির্দেশ করা হয়েছে। মূল্যবোধের এই নির্দেশিকায় স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত দায়সারাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে জাত ও সম্প্রদায় বিরোধী বি. আর. আম্বেদকর বা নেলসন মেন্ডেলার সুস্পষ্ট বক্তব্য। চরম সামাজিক অবক্ষয়ের যুগে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতিতে মূল্যবোধের শিক্ষার উপর আরো গুরুত্ব আরোপিত হওয়া উচিত ছিল বলেই আমরা মনে করি। আমরা আরো মনে করি দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ভারতীয় নেতৃত্বর মতবিনিময়ের পরিসরকে কাজে লাগিয়ে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি আরো সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারত।

সকলের জন্য শিক্ষা বা 'Universal Access' বিষয়টি অনুপস্থিত এই খসড়া প্রস্তাবে। এই প্রস্তাবে 'Access' বলতে কেবলমাত্র র‍্যাম্প, হ্যান্ডরেল, এবং শৌচাগারের কথা বলা হয়েছে। 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন ২০১৬' ও উপেক্ষিত এই প্রস্তাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'প্রতিবন্ধী অধিকার আইন'-এ বর্ণিত নানান সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে বিশেষতঃ শিশু এভং বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত শারীরিক সমস্যাজনিত কারণে পিছিয়ে থাকা অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উপাদান বা উপকরণের যোগান সুনিশ্চিত করা। প্রস্তাবিত এই খসড়ায় শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান বা উপকরণ যোগানের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ শর্তাবলীর বাইরে রাখা হয়েছে যা একটি বিদ্যালয়, ওই বিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজ, তথা সমগ্র দেশ সকলেরই স্বার্থের পরিপন্থী। একটি বিদ্যালয়ের সাফল্য বা ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করে কেবল নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলী চাপিয়ে দেওয়া কখনোই শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের আদর্শ ক্ষেত্র রচনা করতে পারে না।

উচ্চশিক্ষা ঃ প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ধ্যান ধারণাকে নস্যাৎ করে স্বৈরাচারী পরিচালন ব্যবস্থা কায়েম করতে বদ্ধপরিকর। পূর্বের শিক্ষানীতির সাথে প্রস্তাবিত এই নয়া শিক্ষানীতির অনেক মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের GER হবে ৫০%, যদিও এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর কোনো পরিকল্পনা উল্লেখিত হয়নি এই প্রস্তাবে। পূর্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকার অনুসৃত 'World Trade Organisation' (WTO), 'General Agreement on Trade and Services' (GATS) এবং অন্যান্য কিছু বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির কারণে শিক্ষায় উদারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাগুলিও বিবেচিত হয়নি এই প্রস্তাবে। অথচ ইতিমধ্যেই গৃহীত এই পদক্ষেপগুলির কারণে শিক্ষা ক্রমান্বয়ে সাধারণ মানুষের আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে। শিক্ষাখাতে অনুদান ক্রমশ কমিয়ে দেবার ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্র হচ্ছে সংকুচিত, প্রতিনিয়ত সংকুচিত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের নানান সুযোগ সুবিধাও। গবেষণাখাতে বিশেষত বিজ্ঞান গবেষণায় সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতায় ব্যাহত হচ্ছে গবেষণার কাজ, কখনও কখনও তা বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক সমাজকে ক্রমশ কঠিন শর্তাবলীর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC) পরিকল্পিতভাবে সরকার পোষিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধারাবাহিকভাবে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে কোনো প্রকার আলাপ আলোচনা ছাড়াই স্নাতক স্তরে 'Choice Based Credit System' (CBCS)-এর প্রবর্তন সরকারের এই ধরণের কার্যকলাপেরই পরিচায়ক। এই পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করায় উচ্চশিক্ষায় কি প্রভাব পড়ল বা আদৌ কোনো প্রভাব পড়ল কিনা, সে বিষয়ে

কোনো পর্যালোচনা নেই প্রস্তাবিত এই খসড়ায়। বলাবাহুল্য সরকারের এই একমুখী দৃষ্টিভঙ্গি কোনোভাবেই গৃহীত হয়নি ছাত্র, শিক্ষক, আধিকারিক, অভিভাবকসহ সমাজের বৃহত্তর অংশে এবং সরকারি এই একপেশে মনোভাব নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ তালিকাভুক্ত একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হলেও, এই প্রথম আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ত্বাধীন করার প্রয়াস বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালন সমিতিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি এই খসড়া প্রস্তাবে অনুপস্থিত। ফলে প্রস্তাবিত এই আইনে শিক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সব পক্ষের ভূমিকাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেবার প্রত্যক্ষ প্রয়াস বিদ্যমান। প্রাইভেট সেক্টর পরিচালন ব্যবস্থার ধাঁচে 'বোর্ড অফ গভর্নরস'-এর প্রস্তাব করেছে এই খসড়া প্রস্তাব। এই শিক্ষানীতি লাগু হলে সমতা, সামাজিক ন্যায়, শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিবর্তে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিজয় রথ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র অভিমুখে।

প্রস্তাবিত এই খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' (National Education Commission / NEC/ RSA) গঠনের সুপারিশ করেছে। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এই আয়োগের অধীনে 'জাতীয় গবেষণা পরিষদ' (National Research Foundation / NRF), 'উচ্চশিক্ষা অনুদান পরিষদ' (Higher Education Grants Council / HEGC), 'জাতীয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা' (National Higher Education Regulatory Agency / NHERA), 'জাতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক সংস্থা' (National Testing Agency / NTA), 'বহুমুখী শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়' (Multidisciplinary Education and Research University / MERU), 'ভারতীয় উদার কলাবিদ্যা কেন্দ্র' (Indian Institute of Liberal Arts / IILA) ইত্যাদি পরিষদ বা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবে বর্তমান, যা কার্যত দেশের উচ্চশিক্ষা পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে জটিল করে তুলবে বলেই মনে হয়।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ ঃ দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এই আয়োগের সভাপতি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হবেন এই আয়োগের একজন সহ-সভাপতি। এই আয়োগের সদস্য হবেন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী, আমলা এবং রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। যদিও এই আয়োগে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিত্ব থাকবে নামমাত্র এবং পর্যায়ক্রমিক। রাজ্য সরকার এবং আঞ্চলিক প্রশাসন থাকবে এই আয়োগের অধীনে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী 'মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক' পর্যবসিত হবে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক'-এ। এই প্রস্তাব অনুসারে 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ'ই হল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান এবং একমাত্র নিয়ন্ত্রক সংস্থা। এই কমিটি দেশের শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষায় বিনিয়োগ বা সহায়তা সহ সমস্ত বিষয়ে পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করবে। এমনকি ভবিষ্যতের গবেষণার ক্ষেত্র নির্বাচনেও এই আয়োগেই হবে একমাত্র অনুমোদনকারী সংস্থা। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমুখী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। সাথে সাথে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতির কল্যাণে সারা দেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ হবে রাজনৈতিক মেরুকরণের বৃত্ত।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ তালিকাভুক্ত একটি বিষয় হিসাবে বিবেচিত হলেও, এই প্রথম আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভূমিকাকে শিথিল করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রস্তাব অনুসারে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার আর্থিক দায়ভার রাজ্যকে আগের মতো বহন করতে হলেও, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় রাজ্যের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। প্রস্তাবিত এই আইন ভারতীয় সংবিধানকেও এক্ষেত্রে রেয়াত করেনি। নয়া খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী অমিত শক্তির অধিকারী এই 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' কোনোভাবেই দেশের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ'-এর কর্মসমিতি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনাসমূহ মূল্যায়নের সাথে সাথে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রস্তাবিত কার্যাবলী বিচার বিবেচনা করার অধিকারী হলেও প্রস্তাবিত

আইনে 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ'-এর কার্যক্রম মূল্যায়নের কোনো সুযোগই নেই। অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষা আয়োগ' গঠনের পরিকল্পনা কেবল যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর উপর আঘাত নামিয়ে আনবে না, কণ্ঠরোধ করবে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় স্বৈরাচারী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে বারবার সরব হওয়া প্রতিবাদী কণ্ঠকেও।

জাতীয় গবেষণা পরিষদ ঃ প্রস্তাবিত এই নতুন প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি গবেষণা প্রকল্পে বার্ষিক ২০ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেবে। গবেষণার অছিলায় দেশবাসীর প্রদত্ত করের টাকায় বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করবার প্রয়াস এই খসড়ার অন্যতম আপত্তিকর বিষয়। বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির মধ্য দিয়েই বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে বেসরকারি মালিকানাধীন করতে বদ্ধপরিকর। খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী গবেষণায় আর্থিক অনুদানের মাত্রা নির্ধারণের পাশাপাশি গবেষণার বিষয় নির্বাচনেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী এই পরিষদ। কাজেই প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতিতে বিশ্লেষণাত্মক গঠনমূলক গবেষণা অপেক্ষা বাণিজ্যিকভাবে আকর্ষণীয় গবেষণা যে অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই খসড়ায় আরো বলা হয়েছে, গবেষণার প্রসারে 'জাতীয় গবেষণা পরিষদ' সারা দেশে বৎসরে পাঁচশো ডক্টরাল এবং পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রদান করবে। গবেষণার প্রসারে উল্লেখিত সংখ্যা যে নিতান্তই অপ্রতুল, কোনো প্রকার গবেষণা ছাড়াই তা নিশ্চিত করে বলা যায়।

উচ্চশিক্ষা অনুদান পরিষদ ঃ এই খসড়া প্রস্তাবের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়েই অবলুপ্তি ঘটবে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সর্বোচ্চ দুই নিয়ামক সংস্থা 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ' (University Grants Commission / UGC) এবং 'সর্বভারতীয় কারিগরী শিক্ষা সংসদ' (All Indian Council for Technical Education / AICTE)-এর। প্রস্তাবিত 'উচ্চশিক্ষা অনুদান পরিষদ'-এর কার্যাবলী কেবলমাত্র ভাতা এবং উন্নয়নমূলক তহবিলেই সীমাবদ্ধ। এই খসড়া অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কোনো বিষয়েই এই প্রতিষ্ঠানটির কোনো ভূমিকা থাকবে না।

জাতীয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা ঃ উচ্চশিক্ষা বিষয়ক নানা বিষয় নিয়ন্ত্রণ সহ বিভাগীয় প্রধান মনোনয়নের ক্ষমতাও অর্পিত হয়েছে এই 'জাতীয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা'র হাতে। এই খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক শিক্ষকদের মধ্য থেকে কিছু শিক্ষককে নির্বাচন করে তাঁদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশাসক হিসেবে ডিন, বিভাগীয় প্রধান ইত্যাদি পদে মনোনীত করবেন। এই শিক্ষানীতি কার্যকর হলে একদিকে যেমন বর্তমান সময়ের আবর্তিত বিভাগীয় প্রধান ও ডিনের ধারণাটি বিলুপ্ত হবে, অন্যদিকে স্থায়ী বিভাগীয় প্রধান, স্থায়ী ডিনশিপের সাহায্যে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সুরক্ষিত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের কায়েমী স্বার্থ এবং সংকুচিত হবে দুর্নীতিমুক্ত দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার পরিসর। এই খসড়া প্রস্তাবে যে কোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে 'জাতীয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা'র হাতে। 'জাতীয় উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রক সংস্থা'র এই ক্ষমতা কার্যত উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের লাগামহীন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রকেই প্রশস্ত করে।

জাতীয় যোগ্যতা নির্ণায়ক সংস্থা ঃ এই প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্থাটি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পরিচালনা করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সাহায্যে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমহ্রাসমান স্বাধিকারের বিষয়টিকে পাকাপাকিভাবে মুছে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

বহুমুখী শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে বহুমুখী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে 'বহুমুখী শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়' (Multidisciplinary Education and Research University / MERU) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছে।

ভারতীয় উদার কলাবিদ্যা কেন্দ্র ঃ বহুমুখী উচ্চশিক্ষার প্রসারে প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষানীতিতে বহুবার 'তক্ষশীলা' ও 'নালন্দা'র কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রস্তাবিত এই খসড়ায় বলা হয়েছে—'ভারতবর্ষে পবিত্র এবং বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থার এক

সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তক্ষশীলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উদার কলাবিদ্যার ক্ষেত্র রচনা করেছিল।' প্রাচীনকালে উদার কলাবিদ্যায় ৬৪ কলার অর্ন্তভুক্তির কথাও এখানে উল্লেখিত হয়েছে। ৬৪ কলার শিক্ষাদানের লক্ষ্যে 'ভারতীয় উদার কলাবিদ্যা কেন্দ্র' (Indian Institute of Liberal Arts / IILA) স্থাপনের সুপারিশও আলোচ্য খসড়া প্রস্তাবে বর্তমান। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে কি কারণে সংস্কৃতি ও প্রথার নামে বর্তমান শিক্ষাক্রমে পুনরায় প্রাচীন কলাবিদ্যার অর্ন্তভুক্তির সুপারিশ করা হয়েছে।

এই খসড়া প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয়, এবং তৃতীয় শ্রেণিতে পর্যায়ক্রমে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে মাল্টিডিসিপ্লিনারী রিসার্চ ইউনিভার্সিটি, মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিচিং ইউনিভার্সিটি, ও স্বশাসিত মাল্টিডিসিপ্লিনারী কলেজেস্। মাল্টিডিসিপ্লিনারী রিসার্চ ইউনিভার্সিটির প্রাথমিক কাজ হবে গবেষণা, গবেষণার পাশাপাশি এই শ্রেণিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্পবিস্তর পঠন-পাঠনের কাজও পরিচালিত হবে। সমস্ত কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই শ্রেণিভুক্ত হবে এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০০০ থেকে ২৫০০০ পর্যন্ত হবে। মাল্টিডিসিপ্লিনারী টিচিং ইউনিভার্সিটি প্রধানত পঠন-পাঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে এবং অল্প কিছু গবেষণার কাজও পরিচালনা করবে। দেশের সমস্ত মহাবিদ্যালয়কে তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত করার প্রস্তাব এই খসড়ায় বর্তমান। এই খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের কোথায় কোনো অনুমোদিত মহাবিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকবে না। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত মহাবিদ্যালয়কে স্বশাসিত অনুমোদিত শংসাপত্র প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত স্তরে উন্নীত হতে পারবে না সেগুলি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মিশে যাবে। আশঙ্কা এই খসড়া প্রস্তাব কার্যকরী হলে সরকারি অনুদানে পরিচালিত দেশের বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০৩০ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি যেসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শংসাপত্র প্রদানের অনুমতি পাবে সেগুলির পক্ষেও বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। ফলত ভারতীয় উচ্চশিক্ষাঙ্গনে এক বিরাট বিপর্যয় নেমে আসবে।

প্রস্তাবিত খসড়ায় সুপ্রাচীন ভাষার প্রত্যাবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে, যদিও নির্দিষ্ট করে কোনো ভাষার উল্লেখ এখানে নেই। আশঙ্কা এই অছিলায় পৌরাণিক কাহিনী এবং সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তি ঘটবে উচ্চশিক্ষার কোনো কোনো স্তরে। এই প্রস্তাবে ভারতবিদ্যা পাঠের কথা বলা হলেও কি পড়ানো হবে তা উল্লেখ করা হয়নি। এই শিক্ষানীতি অনুসারে একজন গবেষককেও প্রাত্যহিক কাজে যোগাযোগ রক্ষার নিমিত্তে একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে হবে। এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তা হল—ভারতীয় ভাষায় যোগাযোগ রক্ষা কি অনিবার্য নাকি এই অছিলায় ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করবার সরকারি প্রয়াস ক্রমবর্দ্ধমান? ভারতবর্ষের অতীত বহুবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থার নানান শাখার পুনঃপ্রবর্তনের প্রস্তাব এই খসড়ায় বর্তমান। যদিও আয়ুর্বেদ, যোগা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি (আয়ুষ) ইত্যাদি চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেকগুলোই আজ আর বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে স্বীকৃত নয়।

'ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি' এবং 'ডিজিটাল লার্নিং'-এর উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার প্রস্তাবকে প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি খুবই অস্পষ্টভাবে সমর্থন করেছে। 'ডিজিটাল কমিউনিকেশন' শ্রেণীকক্ষ নির্ভর শিক্ষার একটি কার্যকরী বিকল্প হয়ে উঠেছে, এমন প্রমাণ খুবই কম। 'ডিজিটাল' প্রযুক্তি এবং 'ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া' অনেক আকর্ষণীয় সম্ভাবনা তৈরি করলেও শিক্ষার্থীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ও সহায়তাদানের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। শ্রেণিকক্ষে যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং আকর্ষণীয় পরিবেশ রচিত হয় তা 'অনলাইন কোর্স'-এর ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না বা কৃত্রিমভাবে তৈরি করাও সম্ভব নয়। গবেষণাগারের উদ্ভূত পরিস্থিতি কখনোই 'ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম'-এ রচনা করা সম্ভব নয়। বর্তমানে আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অনলাইন' শিক্ষাক্রম চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। কাজেই প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতিতে 'মুক্ত দূরবর্তী শিক্ষাক্রম' (Open Distance Learning / ODL) এবং 'ব্যাপক মুক্ত অনলাইন শিক্ষাক্রম' (Massive Open Online Courses / MOOCS)-এর যে সুপারিশ করা হয়েছে তা অবান্তর।

প্রস্তাবিত এই শিক্ষানীতি শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, আধিকারিক এবং শিক্ষাকর্মীদের প্রতিভা ও মনোবলের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। স্বল্পমেয়াদী, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পাশাপাশি পূর্ণসময়ের নিয়োগ বন্ধ করা, 'পেনশন' সহ অবসরকালীন একাধিক সুযোগ-সুবিধা কাট-ছাঁট, সময় নির্ভর পদোন্নতির পরিবর্তে 'একাডেমিক পারফরমেন্স অ্যাপ্রেইজাল'-এর মতো উৎপাদনশীলতা সূচকের উপর গুরুত্ব আরোপ, শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে শিক্ষক সম্প্রদায়কে ব্রাত্য করে রাখা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাকে অচিরেই একটি অনাকর্ষণীয় পেশায় পরিণত করবে। আন্তর্জাতিক স্তরে ব্রিটেন, চিন এবং ইউরোপের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগ এবং 'পেনশন' প্রক্রিয়াকে শিক্ষাব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বজায় রেখেছে। আমাদের দেশ আমেরিকার 'মডেল', যেখানে নব্য শিক্ষিতদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অস্থায়ী শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়, অনুসরণে বদ্ধপরিকর। এই 'মডেল' অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে শিক্ষাঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিবর্তে শিক্ষার মানের অবনমনের পথকেই প্রশস্ত করবে।

এই খসড়া প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষায় মোট জাতীয় উৎপাদনের (Gross Domestic Product / GDP) ২.৭ শতাংশ ব্যয় বরাদ্দের উল্লেখের পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়েছে আগামী কেন্দ্রীয় বাজেটে উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হবে সরকারি ব্যয়ের ১০ শতাংশ। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে যে কোনো খাতে ব্যয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে মোট জাতীয় উৎপাদনই ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। সর্বজনস্বীকৃত এই ভিত্তির পরিবর্তে সরকারি ব্যয়কে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য এই খসড়ায় কোথাও উল্লেখিত হয়নি। পাশাপাশি এই খসড়াতে আগামী দশ বছরে উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে সরকারি ব্যয়ের ২০ শতাংশের সমতুল করার প্রস্তাব বর্তমান। কিন্তু মজার বিষয় এই বর্দ্ধিত ব্যয় বরাদ্দের কোনো উৎসের উল্লেখ এই খসড়ায় নেই। যদিও খসড়ার এক স্থানে 'লোকহিতৈষী সরকারি তহবিল'-র উল্লেখ আমাদের নজরে পড়ে। সংশয় জাগে প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দের অন্ধগলিতে সরকারি অনুদানে পরিচালিত ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা হারিয়ে যাবে না তো।

এই খসড়া প্রস্তাব অনুযায়ী আগামী ২০৩০ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিদানের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখিত হয়েছে, যথা—'গ্রেডেড অ্যাকরিডিটেশন' [যে পদ্ধতি বর্তমানে কার্যকর] এবং 'বাইনারি অ্যাকরিডিটেশন' [হ্যাঁ অথবা না ভিত্তিক]। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২০৩০ সালের পর একমাত্র 'বাইনারি অ্যাকরিডিটেশন'ই কার্যকরী হবে এবং দেশীয় যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বন্ধ হয়ে যেতে পারে কেবলমাত্র এই পদ্ধতির 'না সূচক' মূল্যায়নে। এই খসড়া উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণের এক অভিনব ধারণার অবতারণা করেছে। ধারণাটি হল—'Light but tight'। উল্লিখিত শ্লোগানে ব্যবহৃত শব্দবন্ধনে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রাসী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয়।

দীর্ঘ ৪৮৭ পৃষ্ঠার খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি (২০১৯)-এর সংক্ষিপ্তসার অনুচ্ছেদগুলিতে উল্লেখিত হয়েছে। এই খসড়া প্রতিবেদনের উপর AIFUCTO, WBCUTA সহ বিভিন্ন অধ্যাপক সংগঠন তাদের মতামত জানায় এবং শিক্ষার স্বার্থের পরিপন্থী বিভিন্ন দিকগুলি উল্লেখ করে এর বিরোধিতা করে। CABE কমিটির সভায় বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা এমনকি গুজরাটের শিক্ষামন্ত্রী এই শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেন। কিন্তু এত বিরোধিতা সত্ত্বেও কেন্দ্র সরকার খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির মূলনীতির বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯-এর সারাংশ প্রকাশ করেছে। ৫৫ পৃষ্ঠার এই দলিলটির সংক্ষিপ্তসার পরবর্তী অংশে উল্লেখ করা হলো।

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির সারাংশ যেটি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে সকলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষায় সকলের সমান অধিকার ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়নি। যেমন একবারের জন্য উল্লেখ করা হয়নি শিক্ষায় সংরক্ষণের বিষয়টি। অপরিবর্তিত থেকেছে স্কুলে তৃতীয় ভাষা শেখানোর তত্ত্ব এবং ৩-৮ বছরের শিশুরা সহজে নতুন ভাষা শিখতে পারে এই বক্তব্য পুনরায় জোরালোভাবে উল্লেখিত হয়েছে করা হয়েছে এই সারাংশে। ভাষা শিক্ষার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা

হয়েছে মাতৃভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষার কথা। বলা হয়েছে বিদ্যালয়গুলিতে দুটি ভাষায় পঠন-পাঠনের কথা।

স্কুল শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করার বিষয়ে কিছু পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে NEP-র সারাংশে—কিন্তু প্রস্তাবিত পরিবর্তন কখনোই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয় না। স্কুলশিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে ২০৩০ সালের স্কুল শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে চার বছরের B.Ed ডিগ্রি। প্রকাশিত সারাংশে স্কুল শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুল কমপ্লেক্সের কথা বলা হয়েছে যেখানে একটি মাধ্যমিক স্কুল এবং তার সঙ্গে ৫-১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে যাবতীয় পূর্ব মাধ্যমিক স্কুলগুলি যুক্ত করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এটি বেশ কিছু বিদ্যালয় বন্ধ করে দেবারই পরোক্ষ প্রয়াস।

বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে খসড়া প্রস্তাবের মত সারাংশেও 'Regulation and Accreditation'-এর কথা বলা আছে। বর্তমানে চালু ব্যবস্থায় কি কি ত্রুটি রয়েছে সেগুলি উল্লেখ করে নতুন যে ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়—প্রস্তাবিত ব্যবস্থা হবে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত এবং 'Light but tight'।

প্রকাশিত সারাংশে উচ্চশিক্ষায় যা বলা হয়েছে খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির সঙ্গে তার পার্থক্য খুবই কম। এখানে 'Under Represented Groups (URG)—SC, ST, OBC, Minority'-দের নানা সুযোগ সুবিধা দেবার কথা বলা হয়েছে—সাধু প্রস্তাব কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। কারণ কেন্দ্র সরকার URG-দের উচ্চশিক্ষায় অধিক অন্তর্ভূক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং অধিক আর্থিক সংস্থান করতে বাধ্য না থাকলে এগুলি শুধু প্রস্তাব হিসাবেই থেকে যাবে, বাস্তবায়িত হবে না। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা। বর্তমান উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এই তিন ধরণের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে এবং ভবিষ্যতে দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনকার থেকে অনেক কম হবে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভবিষ্যতে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে হবে বর্তমানের তুলনায়। কিন্তু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমিয়ে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করা কতটা বাস্তবসম্মত সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতির মতই প্রকাশিত সারাংশে উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ভাষা শিক্ষা, কলাবিদ্যা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির কথা যতটা গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে বিজ্ঞান এবং কারিগরী শিক্ষায় তার এক চতুর্থাংশ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। উচ্চশিক্ষায় টেকনোলজির ব্যবহার সহজে চালু করতে এবং চালু রাখতে 'National Educational Alliance for Technology (NEAT)' নামক একটি সংস্থা খোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে খসড়া প্রস্তাবের সারাংশে। এই সংস্থাটি উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির প্রয়োগের বিষয়টি তদারকির সঙ্গেই উদ্ভাবনা এবং গবেষণার নতুন দিক নির্দেশ করবে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা গবেষণাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণাধীন করার একটি নতুন প্রচেষ্টা এইভাবে করা হবে।

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯-এ RSA-এর কথা বলা হয়েছিল—প্রস্তাব করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। প্রস্তাবিত সারাংশে বাকি জিনিস অপরিবর্তিত রেখে শিক্ষামন্ত্রী RSA-র চেয়ারম্যান হবেন—এই প্রস্তাব করা হয়েছে। শেষে যে কথাটা বলা প্রয়োজন তা হলো প্রকাশিত সারাংশে বলা হয়েছে এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হলো 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে এই শিক্ষানীতি কার্যকর হলে সবকা বিকাশের পরিবর্তে শিক্ষার বিনাশ সুনিশ্চিত।

দেশের শিক্ষাচিত্র

কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সুকৌশলে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দর্শনকেই বদলে দিতে উদ্যত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে নানান পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিনির্ভর যে শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সেই ধারাকে আরো গতিশীল না করে শিক্ষাক্রমে পুনরায় প্রাচীন ভারতীয় কলাবিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে সযত্নে লালিত দেশের বহুত্ববাদের উপর আঘাত হানতে চায়। দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে আসীন হয়েছেন সংঘ সেবকগণ এবং তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল শিক্ষায় গৈরিকীকরণ নিশ্চিত করা। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কেন্দ্র

সরকারের বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ছিল জি.ডি.পি-র ৩.৮ শতাংশ, যেটি ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২.৯১ শতাংশ এবং ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে এর পরিমাণ হয়েছে ২.৭ শতাংশ। এর ফলে বর্তমানে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিদারুণ আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রকল্পগুলি অনুমোদিত হবার পরে সংশ্লিষ্ট আর্থিক অনুদান পেতে নানা সমস্যা হচ্ছে। একাধিক ক্ষেত্রে বহু বিলম্বে আর্থিক অনুদান পাওয়া যাচ্ছে। একাধিক ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তির পর পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি প্রকল্পের টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখার ফলে যে সুদ পাওয়া যায়, এখন সেটিও ফেরত দিতে হচ্ছে। ছাত্র এবং গবেষকদের মাসিক বৃত্তি বহু দেরী করে প্রদান করা হচ্ছে। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে এদের দিন কাটছে। এই পরিস্থিতিতে গবেষক ও ছাত্রের পক্ষে মন দিয়ে পঠন-পাঠন, গবেষণার কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না বহুক্ষেত্রে।

গবেষণা প্রকল্পে এবং বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই অসুবিধাগুলির সঙ্গেই পেশাগত ক্ষেত্রেও অধ্যাপক/ অধ্যাপিকাদের নিরন্তর নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে UGC কর্তৃক নিত্য নতুন আদেশনামা প্রকাশিত হচ্ছে অধাপক ও অধ্যাপিকাদের পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে। এরপর রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত নতুন আদেশনামা যথা সময়ে প্রকাশিত হচ্ছে না এবং এই অজুহাতে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পদোন্নতি বিষয়টি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকছে। UGC-র নথিবদ্ধ Journal-গুলি আগের থেকে না জানিয়ে হঠাৎ হঠাৎ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আগে নথিবদ্ধ ছিল এই Journal-গুলিতে বহু পরিশ্রম করে প্রকাশিত গবেষণা পত্রগুলির জন্য কোনো নম্বর অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের দেওয়া হচ্ছে না। এই ভাবে পদোন্নতি বিষয়টি ক্রমশঃ দুরূহ হয়ে উঠছে। নির্দিষ্ট কোনো নীতি অনুসরণ না করে পুরো বিষয়টিকে তালগোল পাকিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল করে তোলা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যাপকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে খর্ব করার চেষ্টা করা হচ্ছে। গত জুলাই মাসে JNU-তে উপাচার্যের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সংগঠনের ডাকে একদিনের কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য আটচল্লিশ জন অধ্যাপককে শো কজ করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে আইনের সাহায্যে এই অধ্যাপকেরা শো কজের উত্তর দেওয়া থেকে অব্যাহতি পান। এই ধরনের দমনপীড়ন মূলক কাজকর্ম দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও ঘটে চলেছে। অধ্যাপক সমিতির সর্বদাই এই ধরনের স্বৈরাচারী কাজকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

সারা দেশে উচ্চশিক্ষার আঙ্গিনায় সৃষ্টি হয়েছে চরম অস্থিরতা। বর্তমানে রাষ্ট্রশক্তি যেনতেনপ্রকারেণ শিক্ষাঙ্গন দখলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে, গরিষ্ঠ মতকে উপেক্ষা করে দখলদারীই এখন ভারতীয় উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা। এমতাবস্থায় 'পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি' ১০০তম বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে মাত্র সাত বছর দূরে অবস্থান করছে। আগামী এক দশকে দেশ তথা রাজ্যের উচ্চশিক্ষার পরিবেশ আমূল বদলে যাবে এমনটা দাবি করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। কাজেই দেশের সর্বপ্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠনকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, ধারাবাহিক প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, আন্দোলন, আইনী-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-অভিভাবক ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। কেবলমাত্র এই ঐক্যের হাত ধরেই কলুষ মুক্ত হবে গোটা দেশ তথা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গন।

রাজ্যের শিক্ষাচিত্র

দীর্ঘকাল রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনে মূলত মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রাত্যহিক পঠন-পাঠন, পরিচালন, নীতিনির্ধারণ, ভর্তি প্রক্রিয়া, পরীক্ষা ব্যবস্থা সহ গবেষণার কাজ চরম উদ্দেশ্যহীনভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার

প্রবর্তিত 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অ্যান্ড কলেজেস্ (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ২০১৭' ইতিমধ্যেই আমাদের আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করেছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের পরিবর্তে এই কালা কানুন শিক্ষার স্বাধিকার, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকুরীর নিরাপত্তা হরণ করে রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনগুলিকে কার্যত দলীয় কার্যালয়ে পর্যবসিত করতে উদ্যত। যথার্থ পর্যালোচনা, মতবিনিময়, উপযুক্ত পরিকাঠামোর সংস্থান না করেই 'চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম'-এর প্রবর্তন রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় যে ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে পারে, সমিতির এই আশঙ্কাই আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। অপ্রতুল পরিকাঠামো, ক্রমহ্রাসমান শিক্ষক, আধিকারিক, গ্রন্থাগারিকসহ শিক্ষাকর্মীর অভাবে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা যখন ধুঁকছে, ঠিক তখনই সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা না করে একতরফাভাবে এই 'চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম'-এর প্রবর্তন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যে 'চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম'-এর প্রবর্তন করেছেন, তা কার্যত স্নাতক পর্যায়ে 'সেমিস্টার সিস্টেম' ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

স্নাতকস্তরে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাবিত 'অনলাইন' ভর্ত্তি-প্রক্রিয়ার কদর্য রূপ ইতিমধ্যেই রাজ্যবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। স্নাতকস্তরে ভর্ত্তি-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে সমিতি পূর্বের ন্যায় রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্ত বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে বিষয়-প্রতি মোট আসন সংখ্যা ঘোষণার দাবি জানায়। এই ঘোষণার পাশাপাশি সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কেন্দ্রীয় 'অনলাইন' ভর্ত্তি-প্রক্রিয়া প্রবর্তনেরও দাবি জানায়। সমিতি মনে করে কেন্দ্রীয়ভাবে স্নাতকস্তরে আসন সংখ্যা ঘোষণার সাথে সাথে কেন্দ্রীয়ভাবে 'অনলাইন' ভর্ত্তি-প্রক্রিয়া চালু করতে না পারলে এই 'অনলাইন' ভর্ত্তি-প্রক্রিয়া কার্যত শাসকদলের মদতপুষ্ট তোলাবাজদের শিল্পকলায় পরিণত হবে।

অধ্যাপক সমিতি অতীতে শর্ত সাপেক্ষে (উপযুক্ত গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, দক্ষ শিক্ষক) বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম প্রচলনের দাবি জানালেও, বর্তমানে সমিতি মনে করে বিষয়টির পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মহাবিদ্যালয়ে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু হয়েছে, তেমনি রাজ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা (বর্তমানে চব্বিশ)। উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আগামীতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই সমিতি মনে করে। সমিতির সদস্যবন্ধুদের কাছ থেকে যতটা জেনেছি তার ভিত্তিতে এটা বলা যাবে না যে, সমস্ত মহাবিদ্যালয়ে (অন্তত সাতটি) নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের 'বোর্ড অফ স্টাডিস'-এর 'চেয়ারম্যান/চেয়ারপার্সন'-এর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই নির্দিষ্ট বিভাগের একজন অধ্যাপকবন্ধু। এমতাবস্থায় সমিতি মনে করে মহাবিদ্যালয়গুলি কতটা স্বচ্ছতার সাথে কার্য পরিচালনা করছে, বিশেষত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পরীক্ষা ও ফলপ্রকাশের দায়িত্ব যখন প্রতিটি মহাবিদ্যালয়কেই পালন করতে হয়, সে বিষয়ের পাশাপাশি পাঠক্রমের 'কোর্স ফি' বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কি পরিমাণ অর্থ নেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কেও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে চরম নৈরাজ্য। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষিত মেধাবী যুবক যুবতীদের সামনে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে সরকারি দুর্নীতির অভিযোগ আজ আর নতুন কোনো বিষয় নয়। যোগ্য চাকুরীপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের ন্যায্য দাবি আদায়ে নেমে আসতে হচ্ছে রাজপথে। কখনো তাদের জুটছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তাচ্ছিল্য, কখনো বা পুলিশের নির্মম অত্যাচার, কখনো বা রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস। সে আশ্বাসও ভবিষ্যতের শিক্ষককুলের কাছে আজও অধরা মাধুরীই হয়ে রইল। পাশাপাশি রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু হলেও প্রশ্ন উঠেছে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে। বর্তমানে কলেজ সার্ভিস

কমিশন ইন্টারভিউ-এর নম্বর বহুলাংশে (মোট নম্বরের ২০%) বৃদ্ধি করে প্রতিযোগীদের মনস্তত্ত্বের উপর নেতিবাচক চাপ তৈরি করেছে। সফল প্রার্থীদের নামের তালিকায় প্রত্যেকের প্রাপ্ত নম্বর প্রকাশ করা বন্ধ করে কমিশন প্রার্থীদের মনে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে অবিশ্বাস যা রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার দীনতাকেই প্রকট করে।

অধ্যাপক সমিতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক, অতিথি শিক্ষক, চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং আংশিক সময়ের শিক্ষকবন্ধুদের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে বিগত সরকার এই সব বন্ধুদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ নিশ্চিত করার পাশাপাশি যে বেতনক্রম চালু করেছিলেন, বর্তমান সরকার সেই বিষয়ে আর কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেননি। দীর্ঘকাল পর গত আগস্ট মাসে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সকল বন্ধুদের বিষয়ে যে সরকারি নীতি ঘোষণা করেছেন, যদিও এই প্রতিবেদন লিখবার দিন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো সরকারি আদেশনামা প্রকাশিত হয়নি, সেই ঘোষণা অধিকাংশ বন্ধুদের উৎসাহিত করার পরিবর্তে বন্ধুদের মধ্যে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক সর্বাধিক লাভবান হবেন অতিথি শিক্ষকবন্ধুরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমিতির নেতৃত্ব চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক, আংশিক সময়ের শিক্ষক, অতিথি শিক্ষক এবং চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের নির্দিষ্ট চাকুরীর শর্ত এবং নির্দিষ্ট পে স্কেল-এর দাবিতে যতবার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সাথে আলোচনা করেছেন ততবারই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অতিথি শিক্ষকবন্ধুদের বিষয়ে তীব্র আপত্তি ব্যক্ত করেছেন। চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক এবং আংশিক সময়ের শিক্ষকবন্ধুদের প্রতি রাজ্য সরকারের দীর্ঘ উদাসীনতা এবং উপেক্ষার কারণে অধ্যাপক সমিতি ইতোমধ্যেই এই সকল বন্ধুদের নির্দিষ্ট চাকুরীর শর্ত এবং নির্দিষ্ট পে-স্কেল-এর দাবিতে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছে। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের অবস্থা আরো করুণ। কোনো কোনো চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধু দশ বারো বছরের বেশি সময়কাল শিক্ষাঙ্গনের গ্রন্থাগারকে সচল রেখেও আজ তাঁরা ভুগছেন কাজ হারাবার ভয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবস্থার সুযোগ নিয়ে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের বেতন, কখনো কখনো চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের পদাবনতি ঘটিয়ে তাঁদের গ্রন্থাগার সহায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের মেনে নিতে হচ্ছে নানান ধরনের অসম্মান ও অত্যাচার। অধ্যাপক সমিতি চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকবন্ধুদের জন্যও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২০১১ সাল থেকে আমাদের রাজ্যে উচ্চশিক্ষায় গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত। 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনির্ভাসিটি অ্যান্ড কলেজেস্ (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ২০১৭' কার্যকর হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গবাসী প্রত্যাশা করেছিলেন, এই আইনে ন্যূনতম যতটুকু গণতান্ত্রিক পরিসরের বন্দোবস্ত আছে তা হয়তো এবার কার্যকর হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। ২০১১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা পরিচালন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো গুণগত পরিবর্তন হয়নি। ফলে মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ একই সাথে অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলে 'কলেজ সার্ভিস কমিশন'-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বের পাশাপাশি রাজ্যের নব নির্মিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বও সামলে চলেছেন অবলীলাক্রমে। রাজ্যজুড়ে এমন উদাহরণ বিরল নয়। বর্তমান ক্ষমতাসীন রাজ্য সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত 'সিনেট', 'সিন্ডিকেট', 'কোর্ট', 'কাউন্সিল'। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সরকার মনোনীত তথাকথিত শিক্ষাবিদ কর্তৃক। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে আরম্ভ করে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকের পদে চলছে 'মিউজিকাল চেয়ার গেম'। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইসব পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হচ্ছে আস্থাভাজনদের। প্রশ্নাতীত আনুগত্যে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে পদচ্যুত হচ্ছেন উপাচার্য থেকে আধিকারিক সকলেই।

কাজেই পদ বাঁচাতে ব্যস্ত সকলেই দিনগত পাপক্ষয়ের অছিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন।

আলোচ্য সময়কালে একাধিক কলেজে অধ্যাপকরা শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছেন শাসকদলের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের দ্বারা। মুর্শিদাবাদের শ্রীপত সিং কলেজে অধ্যাপক হিমাদ্রি গুহঠাকুরতার উপর বর্বরোচিত শারীরিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এই অধ্যাপক অধ্যক্ষের অগণতান্ত্রিক, বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করেছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষর পরোক্ষ মদতে কিছু দুষ্কৃতী অধ্যাপক হিমাদ্রি গুহঠাকুরতাকে আক্রমণ করে বলে তিনি দাবী করেন। অধ্যাপক সমিতি এবং অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সংগঠন এর প্রতিবাদে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মৌলালী পর্যন্ত মিছিল করে। সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটিও এই বিষয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করেছে।

হুগলীর হীরালাল পাল কলেজে দু'দল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গোলমাল থামাতে গিয়ে শাসকদলের অনুগত ছাত্র সংসদের নেতাদের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হন অধ্যাপক সুব্রত চ্যাটার্জী। দুরদর্শনে তাঁর হতবাক বিহ্বল চাহনি দেখে সহকর্মী হিসাবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গেছে। এ কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি! এই নৈরাজ্যের শেষ কোথায়? সমিতি এই ঘটনার প্রতিবাদে কর্মসূচী পালন করেছে, মিছিল করেছে। হুগলী জেলার কর্মসূচীতে সমিতির নেতৃত্ব উপস্থিত থেকেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানে নিরন্তর আন্দোলন করতে অধ্যাপক সমিতি বদ্ধপরিকর।

গত বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদনে কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছিল। সমিতির পক্ষ থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নজরে বিষয়টিকে আনা হয় এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হয়। পরবর্তীকালে অধ্যক্ষকে অন্যত্র বদলি করা হয় এবং একই সঙ্গে দুই অধ্যাপককেও ঐ কলেজ থেকে বদলি করা হয় অন্যত্র। এক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধার কারণে বিষয়টি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়নি।

পূজাবকাশের প্রাক্কালে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের দুই অধ্যাপককে ২০১৭ কালা কানুন মোতাবেক পাবলিক ইন্টারেস্টে অন্যত্র বদলি করা হয়, দশদিনের সময় দিয়ে। উল্লেখ করা প্রয়োজন ঐ দশ দিনই কলেজে পুজোর ছুটি ছিল। ছুটির পর প্রথম দিনই ঐ দুই অধ্যাপককে রিলিজ অর্ডার ধরানো হয়। বিষয়টি নিয়ে ঐ দুই অধ্যাপক আদালতের দ্বারস্থ হন। গত ১লা নভেম্বর, ২০১৯ মহামান্য আদালত বদলির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। দুই অধ্যাপকের এই লড়াইয়ে সমিতি সর্বদাই পাশে থেকেছে।

সামগ্রিক ভাবে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। আগামী দিনে এই পরিস্থিতির উন্নতির কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তাই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে লাগাতার ঐক্যবদ্ধ অধ্যাপক আন্দোলনই একমাত্র পথ।

AIFUCTO সংবাদ ঃ

সারাদেশেই উচ্চশিক্ষা বর্তমানে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশেষত 'পাবলিক ফান্ডেড এডুকেশন' ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ছে শিক্ষায় অধিকতর বেসরকারীকরণের ফলে। অথচ কেন্দ্র সরকারের মুখে প্রায়ই 'ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট'-এর কথা শোনা যায়। এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে এবং শিক্ষকদের পেশাগত দাবি দাওয়া নিয়ে AIFUCTO-র লাগাতার আন্দোলন জারি রয়েছে। গত নভেম্বর মাসে কন্যাকুমারীতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার পর ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষা কর্মীদের সঙ্গে AIFUCTO-র নেতৃত্ব সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে দিল্লীর যন্তর-মন্তরে এক সুবিশাল জমায়েত করে মিছিল করা হয়। এই কর্মসূচীতে আমাদের রাজ্য থেকে সত্তর জনেরও বেশি অধ্যাপক যোগ দেন। গত অক্টোবর মাসে চন্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত AIFUCTO-র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২২শ নভেম্বর, ২০১৯ প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে যে চারটি রাজ্য এখনো সপ্তম বেতনক্রমের সুপারিশ লাগু করা হয়নি সেই রাজ্যগুলিতে দ্রুত সপ্তম বেতনক্রমের সুপারিশ লাগু করার দাবিতে ধর্ণা ও বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হবে। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য AIFUCTO-র সাধারণ সম্পাদক এই চারটি রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ, মনিপুর, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাব) মুখ্যমন্ত্রীকে দ্রুত সপ্তম বেতনক্রমের সুপারিশ চালু করার দাবি জানিয়ে চিঠি লেখেন। অন্য তিনটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঐ চিঠির উত্তর দিলেও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কোনো উত্তর এখনো দেন নি।

১৪ নভেম্বর NEP প্রত্যাহার করার দাবিতে AIFUCTO, FEDCUTA, DUTA, JFME সহ আরো কিছু সংগঠন দিল্লীতে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করেন। AIFUCTO-র আহ্বানে গত ২২ নভেম্বর ২০১৯, NEP বাতিলের দাবিতে প্রতিটি রাজ্যের রাজধানীতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়েছে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থে AIFUCTO সর্বদাই লড়াই জারি রেখেছে। দেশজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে AIFUCTO। শিক্ষা ও শিক্ষকদের স্বার্থে AIFUCTO সর্বদাই সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। AIFUCTO-র স্ট্যাটুটরি কনফারেন্স আগামী ৭-৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বন্ধুদের এখন থেকেই যোগদানের প্রস্তুতি নিতে হবে, অন্যথায় সম্মেলনে যোগদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

সমিতির তহবিল ঃ

বিগত আর্থিক বছরে সমিতির দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিল থেকে নিয়মিত অনুদানের মাধ্যমে আমরা যাদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, তাদের নাম নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং		নাম	প্রত্যেক মাসে টাকার পরিমাণ
১।	শিল্পী কর্মকার	গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ (পদার্থবিদ্যা-অনার্স)	৮০০=০০
২।	পরমা পোলে	বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ (প্রাণীবিদ্যা - অনার্স)	৮০০=০০
৩।	রিয়া চক্রবর্তী	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এম.এস.সি. - ফুড এ্যান্ড নিউট্রিশন)	৮০০=০০
৪।	শুভম লাহা	রাজা প্যারীমোহন কলেজ (বি.এ. জেনারেল)	৮০০=০০
৫।	দীপা সাহু	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এম.এ.)	৮০০=০০

সংগঠন ও আন্দোলন ঃ

বহরমপুরে অক্টোবর ২০১৮-তে অনুষ্ঠিত সমিতির রাজ্য সম্মেলনের পর বিগত একবছরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের পরিবেশ ভয়ঙ্কর রকম কলুষিত হয়েছে। শাসকদলের বশংবদ না হলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অমানুষিক অপমান, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ ও উপাচার্যরা ওয়েবকুটার সদস্যদের মানসিক নিগ্রহ এবং পেশাগত নানা সমস্যায় জর্জরিত করেছেন। এইরকম এক আগ্রাসী পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে সমিতি লড়াই করে গেছে। বিগত প্রায় একদশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনে যে অরাজকতা চলেছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে সংগঠন পরিচালিত হয়। অত্যন্ত গর্বের বিষয় এই যে নিরন্তর আগ্রাসন, ভয়ভীতি প্রদর্শন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অধ্যাপকদের অন্য কলেজে বদলি করে দেওয়া—এত কিছুর পরেও আমাদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা গতবারের সদস্য সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে।

শিক্ষাঙ্গনে বহিরাগতদের অবাধ আনাগোনা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সমাজবিরোধী, তোলাবাজ ও কন্ট্রাকটারদের যথেচ্ছ অনুপ্রবেশ এরাজ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যে ক্ষতি বিগত কয়েক বছরে করেছে তা অপূরণীয়। অধ্যাপক সমিতির সদস্যরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অকথ্য অপমান লাঞ্ছনা ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে দাঁড়িয়েও প্রতিবাদ জানিয়েছে ও বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচী সংগঠিত করেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঠনপাঠন ও গবেষণা।

এমনিতেই পঠন-পাঠনের পরিস্থিতি শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছে ছিল। চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম (CBCS) চালু হওয়ার পর পঠন-পাঠনের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। প্রথমতঃ সেমিস্টার সিস্টেমে বিপুল আয়তনের পাঠক্রম যথাযথ ভাবে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক ক্লাশ দেওয়া অবাস্তব কল্পনা। সেই সঙ্গে বিপুল ছাত্র ভর্তি সি.বি.সি.এস সিস্টেমে এক বড় অন্তরায়। কার্যতঃ সি.বি.সি.এস সিস্টেমের নামে অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোর কারণে বেশির ভাগ কলেজেই ছাত্রছাত্রীদের লিমিটেড চয়েস দেওয়া হচ্ছে। অপ্রতুল পরিকাঠামোর কারণে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের গভীরতা সংকটজনকভাবে কমে চলেছে। আরেকটি বিপজ্জনক দিক হল এই যে ইন্টারনাল এ্যাসেসমেন্ট ও এ্যাটেনডেনস সহ যে নম্বর কলেজগুলির হাতে থাকছে সেই নম্বরে স্বচ্ছতা থাকছে না অনেক সময়। কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের অলিখিত নির্দেশ আসছে ছাত্রছাত্রীদের এমনভাবে ইন্টারন্যাল নম্বর দিতে হবে যেন মূল থিওরী পরীক্ষায় তাকে পাশ করার প্রশ্নে খুব চাপে থাকতে না হয়। ওয়েবকুটা প্রথম থেকে দাবি জানিয়ে আসছে যে উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া সি.বি.সি.এস সিস্টেম লাগু করা হলে তার পরিণাম ভয়াবহ হবে। সেই দাবিতে কর্ণপাত না করে তড়িঘড়ি সি.বি.সি.এস. লাগু করে শিক্ষাব্যবস্থাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। ২০১৭ শিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ আইন যখন বিল আকারে উত্থাপিত হয় বিধানসভায় সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল অধ্যাপক সমিতি। বিলটি বিধানসভায় পাশ হবার দিন 'বিধানসভা অভিযান' করে পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে পড়েছিল ওয়েবকুটা। শুধু পথে নেমে আন্দোলন নয়, এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেছে অধ্যাপক সমিতি। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

এই আইন, আপনারা সকলেই অবগত আছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্বাধিকার হরণের অপচেষ্টায় দুষ্ট। বস্তুত এই আইনের ছত্রে ছত্রে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরে সরকারি হস্তক্ষেপ তথা ব'কলমে শাসক দলের দলীয় নিয়ন্ত্রণকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এই আইনের অপপ্রয়োগে রাজ্যের এক বড় অংশের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকারা সন্ত্রস্ত। কলেজে কলেজে শাসক দলের অনুগত নয় এমন অধ্যাপকদের এই আইন প্রয়োগ করে 'পাবলিক ইনটারেস্ট'-এ বদলি করা হচ্ছে। অধ্যক্ষরাও এর থেকে ছাড় পাচ্ছেন না। আমাদের চাকরিতে নিয়োগের সময় বদলির কোনো শর্ত নিয়োগ পত্রে ছিল না। অথচ শিক্ষা আইনে তিন ধরনের বদলির ফতোয়া জারি করা হয়েছে। আবেদনের ভিত্তিতে ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও ব্যাপক দুর্নীতি স্বজনপোষণ এবং আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ আসছে।

দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও আর্থিক লেনদেনের রমরমা শুধু বদলির ক্ষেত্রে নয়, চলেছে অধ্যাপকদের পেশাগত বিভিন্ন বিষয়ে। পদোন্নতির প্রশ্নে চরম হেনস্থা ও অপমানের শিকার হতে হচ্ছে বড় অংশের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের। চলেছে বিকাশভবনের আধিকারিক ও করণিকদের একাংশের চরম দুর্নীতি ও শিক্ষকদের প্রতি দুর্ব্যবহার। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয়া ডি.পি.আইকে এই বিষয়ে সমিতির তরফে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানিয়েও কোনো ফল হয়নি। নবনিযুক্ত বহু অধ্যাপকের fixation বিলম্বিত হচ্ছে কোনো কোনো অধ্যক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈষম্যমূলক আচরণে। Fixation ও Promotion-এর ক্ষেত্রে বিকাশভবনের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের একাংশের অহেতুক হেনস্থা করার প্রবণতায় শিক্ষকরা কার্যত অসহায়। বকেয়া অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বিকাশভবনের আনাচে কানাচে উৎকোচ গ্রহণের গুরুতর অভিযোগ আসছে থেকে থেকে।

পার্ট টাইম, কন্ট্রাক্টচুয়াল হোলটাইম টিচার, গ্রন্থাগারিকদের সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম ও সুনির্দিষ্ট চাকরির শর্তাবলির দাবিতে সমিতি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে, এ বিষয়ে সমিতির নেতৃত্বে বহু শিক্ষক আদালতে মামলা করেছেন। ইতোমধ্যে এই মামলার দুটি আশাব্যঞ্জক শুনানী হয়েছে। অন্যদিকে পার্ট টাইম/কন্ট্রাক্টচুয়াল হোলটাইম এবং অতিথি শিক্ষকদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একটি ঘোষণা উক্ত অংশের শিক্ষকদের মধ্যে একাদিক্রমে আশা ও আশঙ্কার সঞ্চার করেছে।

বিগত কয়েকবছর ধরে PTT/CWTT এবং GUEST TEACHER-দের নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনে আছে সমিতি। ২০১৭ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তক্রমে শুধুমাত্র Ad-hoc শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক বন্ধুদের পেশাগত সমস্যা নি

২০১৮ সালে ২২ মার্চ অধ্যাপক সমিতি রাজপথে নামে ও বিকাশভবন অভিযান করে। অস্থায়ী শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক বন্ধু ছাড়াও অসংখ্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এই বিকাশ ভবন অভিযানে সামিল হয়েছিলেন। এই কর্মসূচীর দাবিগুলি ছিল—(ক) অস্থায়ী শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য নির্দিষ্ট বেতনক্রম ও সুনির্দিষ্ট চাকুরির শর্তাবলী প্রণয়ন (খ) এই প্রশ্নে 'সমকাজে সমবেতন' নীতির প্রয়োগ এবং (গ) সকল অতিথি ও কলেজ নিযুক্ত চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সরকারি পে-প্যাকেটের আওতাভুক্ত করা। পরবর্তী কালে শুধুমাত্র এই অংশের শিক্ষকদের দাবিগুলি নিয়ে আমরা সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং দফায় দফায় আলোচনা করি। অতিথি শিক্ষকদের বঞ্চনা নিয়ে এবং একটি সুনির্দিষ্ট বেতনক্রমের দাবি জানিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে অসংখ্য বার দরবার করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে PTT/CWTT নিয়ে অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্ব আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত এই মামলার শুনানী ও অগ্রগতি সন্তোষজনক। সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম ও সুনির্দিষ্ট চাকরির শর্তাবলীর পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় বেশ কিছু প্রশ্নে বিভ্রান্তির অবকাশ থাকছে। এই সংক্রান্তের আদেশনামা বের না হওয়া পর্যন্ত এই সংশয় থেকেই যাবে। অবশ্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় এই প্রথম অতিথি শিক্ষকদেরও পেশাগত প্রশ্নে সরকারি ভাবে মান্যতা দেওয়া হল, যে দাবি প্রথম থেকে করে আসছিল অধ্যাপক সমিতি।

উত্তরবঙ্গে GTA Act মোতাবেক ৯টি হিল কলেজ GTA-এর আওতাভুক্ত হয়। কিন্তু হিল কলেজগুলির শিক্ষকদের দুর্দশা ও বঞ্চনা এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে। হিল কলেজের শিক্ষকদের অদ্যাবধি বেতনবৃদ্ধির বকেয়া, পদোন্নতিজনিত বকেয়া, M.Phil/P.hd বকেয়া সহ প্রায় ২,৭১,৬৭,৮২৫ টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। হিল কলেজের অধ্যাপকরা ২০০৬ ষষ্ঠ বেতনক্রমের এযাবৎ প্রাপ্ত শেষ কিস্তির বকেয়া টাকাও পান নি। এই খাতে ৭১,০৫,২৩৭ টাকা যা ২০১৭ সালের মার্চ মাসেই (sanction হয়েছে বলে জানা যায়) শুধু তাই নয় এই রাজ্যের অন্যান্য অংশে কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য বিবিধ প্রকল্প যেমন West Bengal Health Scheme, E-Service Book, E-Pension ইত্যাদি সুবিধাদি থেকে হিল কলেজের শিক্ষকরা এখনও বঞ্চিত। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল এ্যাক্ট (GTA-এর অনুচ্ছেদ-২) Art 26 (Clause VI) GTA-এর অধীনে একটি হায়ার এডুকেশন সেল খোলা এবং জয়েন্ট ডিরেক্টর পদে একজনের অধীনে অফিস পরিচালনা করার অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও HEC গঠন হয়নি অথচ HEC গঠিত হলে উদ্ভূত অনেক সমস্যা বহু আগেই সমাধান হতে পারতো।

বর্তমান সরকারের শিক্ষকদের প্রতি বিরূপ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সেই সঙ্গে অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত আগ্রাসী মনোভাব মোকাবিলা করাই বিগত কয়েক বছর ধরে হয়ে দাঁড়িয়েছে সমিতির সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলিতে বহিরাগত ও দুর্বৃত্তদের আনাগোনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল অধ্যাপক সমিতির সংগঠনকে দুর্বল করা। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে অধ্যাপক সমিতিকে দুর্বল করার এই চক্রান্তে প্রয়োগ হয়েছে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতাও। সামিল হয়েছেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের শিক্ষক, সেই সঙ্গে বহু অধ্যক্ষ ও উপাচার্য। বিকাশ ভবনের এক অংশের কর্মচারী আমলা ও আধিকারিকদের সাথে যোগসাজসে অধ্যাপক সমিতিকে ও তাঁর সদস্যদের হেনস্থা করে গেছে বিগত দিনগুলিতে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমিতির সাংগঠনিক বুনিয়াদকে আলগা করতে না পেরে বর্তমান সরকার উপর্যুপরি আঘাত হেনেছে শিক্ষকদের উপর। লাগু হয়েছে একের পর এক শিক্ষক বিরোধী এবং শিক্ষকতার পেশার পক্ষে অসম্মানজনক আচরণবিধি। বলা বাহুল্য শিক্ষকদের ভয় দেখিয়ে সমিতিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনকে রক্ষাকবচ করে পাবলিক ইন্টারেস্টের নামে কলেজে কলেজে শিক্ষকদের বদলি করা শুরু হয়েছে যা কার্যত শাসকদলের আনুগত্য স্বীকার না করার Punishment Posting। কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজ, ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও নেতাজীনগর কলেজে ইতিমধ্যে এই transfer প্রয়োগ হয়েছে। এই বিষয়ে পূর্বেই বিশদে আলোচনা হয়েছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মূলত বৌদ্ধিক চর্চার প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও কর্পোরেট অফিসের মতো দিকে দিকে বায়োমেট্রিক এ্যাটেন্ডেন্স চালু করায় অতি সক্রিয় কিছু অধ্যক্ষ ও উপাচার্য। অধ্যাপক সমিতি অভিনন্দন জানায় কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের, যেখানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করে বায়োমেট্রিক চালু করার অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে সমর্থ হয়েছেন শিক্ষকরা।

একইভাবে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষরা সক্রিয় হয়েছেন অধ্যাপকদের অর্জিত অধিকার সপ্তাহে একদিন প্রিপারেটরি ডে হিসেবে অতিবাহিত করার অধিকার কেড়ে নিতে।

যখন-ই কোনো নির্বাচন উপস্থিত হয় - তা সে পঞ্চায়েত, কর্পোরেশন, বিধানসভা কি লোকসভা—ভোট হলেই খোঁজ পড়ে শিক্ষকদের/অধ্যাপকদের—শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে, সিলেবাস মাঝপথে ফেলে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফেলে ছুটতে হয় ভোটের ডিউটির ট্রেনিং নিতে। এখন হামেশাই এমন হয় যে অধ্যাপকদের পদমর্যাদার পরোয়া না করে তাদের চতুর্থ বা পঞ্চম পোলিং পার্সোনালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিবার আমাদের দ্বারস্থ হতে হয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষরা এ বিষয়ে সচরাচর কোনো সাহায্য করে না।

কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ ঃ

গ্রন্থাগারের পুরানো/জরাজীর্ণ/সিলেবাস পাল্টে যাওয়া বাতিল বইয়ের কোনো নিষ্কাশন-পদ্ধতি (Weed-out) নিয়ে কোনো নীতি নেই। এর একটা সুনির্দিষ্ট নীতি লাগু করা প্রয়োজন।

বই পত্র-পত্রিকা বাঁধাই রক্ষণাবেক্ষণ, কেনা ইত্যাদির জন্য কলেজ বাজেটের ৬-১০ শতাংশ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা দরকার।

মহামান্য কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশনামায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষক মর্যাদা দেওয়া হলেও একাধিক কলেজে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাকর্মীদের (অশিক্ষক) হাজিরা খাতায় সই করানো হচ্ছে। অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

সপ্তাহে একদিন শিক্ষকদের মতো P-Day দেওয়ার দাবি উঠেছে। কারণ ঐ দিন কলেজের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যাওয়া যায়, সেখানে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সফটওয়ারের কাজ দেখা ও শেখা যেতে পারে, আবার CAS সম্পর্কিত বই পত্র পত্রিকায় লেখা প্রকাশের জন্য তথ্যসংগ্রহ, সমীক্ষা প্রভৃতি করা যায়।

গ্রন্থাগারিকদের Leave Rules বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয় Statue-এ উল্লেখ থাকা দরকার। কিন্তু সেই Statute প্রকাশের বিষয়টিও অনিশ্চিত।

কয়েকবছর আগেও UGC-র Minor Research Project-এ গ্রন্থাগারিকরা অংশ নিতে পারতেন। বিষয়টি পুনরায় চালু করা দরকার।

গবেষণা ও সেমিনার বা কনফারেন্সে যোগদানের জন্য সবেতন ছুটি থাকা দরকার।

বেতন ও প্রমোশন, অবসর প্রভৃতি যেন কলেজ শিক্ষকদের মতোই হয় তা দেখার দরকার।

Library Clerk নিয়োগে কর্মপ্রার্থীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট ডিগ্রিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হোক। এর ফলে গ্রন্থাগারে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে সুবিধা হবে।

চুক্তিভিত্তিক ও আংশিক সময়ের গ্রন্থাগারিকদের এই ধরনের শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন ও ৬০ বছর পর্যন্ত অবসরের বয়স ও মর্যাদার সঙ্গে কাজে বহাল রাখতে হবে।

বহরমপুর সম্মেলনের পর থেকে সারাবছর ব্যাপী অধ্যাপক সমিতি শিক্ষকদের পেশাগত দাবিদাওয়া এবং শিক্ষাঙ্গনে মর্যাদার সঙ্গে পাঠদানের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে নানান আন্দোলন কর্মসূচীতে নিয়োজিত থেকেছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক শিক্ষক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইতেও পিছিয়ে থাকেনি সমিতি। বিগত পে-স্কেলে বর্তমান সরকার যখন আঠাশ মাসের ন্যায্য বকেয়া থেকে শিক্ষকদের বঞ্চিত করে তখন অবস্থান, ধর্ণা, বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি আদালতে মামলা করে সমিতি। সকলেই অবগত আছেন যে আঠাশ মাসের বকেয়া এবং এম.ফিল/পি.এইচ.ডি ইনক্রিমেন্টের বিষয় আদালতে ঐতিহাসিক জয় পায় সমিতি। ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানেও সমিতি আদালতে মামলা লড়ছে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ আইন এবং পার্ট টাইম ও কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষকদের সুনির্দিষ্ট চাকুরির শর্তাবলী এবং সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম নিয়ে। শিক্ষা আইন নিয়ে মামলাটি চলেছে প্রায় দুবছর ধরে। এই মামলাগুলির জন্য যে বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে তাতে সমিতির সদস্যদের প্রদত্ত স্টাগেল ফান্ড ছিল অন্যতম ভরসা। এখনও প্রচুর অর্থের দরকার এই মামলাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে সমিতির কলেজ স্ট্রীটের ঐতিহ্যবাহী অফিস সংলগ্ন আরেকটি ছোট ঘরের টেনেন্সি ট্রান্সফার করিয়ে ঘর ব্যবহারের অধিকার পাওয়া গেছে। এর জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। আদালতের বর্তমান মামলা দুটির মধ্যে শিক্ষা আইনের মামলায় অধ্যাপক সমিতি সাম্প্রতিক কালে পাবলিক ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে একটি অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিত লাভ করেছে। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও না হলেও এই অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ নিঃসন্দেহে সমিতির জয়।

সারাবছর ধরে ইউ.জি.সি-র সপ্তম বেতনক্রম চালু, এ্যাডহক অধ্যাপক গ্রন্থাগারিক বেতনক্রম, এবং চাকরির শর্তাবলি চালু, পাশাপাশি অতিথি অধ্যাপকদের জন্য সম্মানজনক চাকরির শর্ত প্রণয়ন এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের জন্য সপ্তম বেতনক্রমের সুপারিশ অনুযায়ী পেনশন চালু—এই সমস্ত দাবিতে ওয়েবকুটা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন ও বিক্ষোভ কর্মসূচী চালিয়ে গেছে। ২০১৯শে ১৫ই মার্চ এই দাবিতে অধ্যাপক সমিতি রাস্তায় নামে আচার্য সদন থেকে বিকাশভবন পর্যন্ত মিছিল করে।

পেশাগত ও বিভিন্ন শিক্ষা ও পঠন-পাঠন বিষয়ক দাবিদাওয়া নিয়ে ৫ই জুন ওয়েবকুটার এক প্রতিনিধি দল শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। এই বৈঠকে অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল রাজ্যের কলেজে কলেজে উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া CBCS সিস্টেম চালু করায় উদ্ভূত সমস্যা। এই সময় থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যাপক সমিতি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে আসছে CBCS সিস্টেম নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে একটি কর্মশালা আহ্বান করার। পেশাগত দাবিদাওয়া শিক্ষক বিরোধী আইন প্রণয়ন, পঠন-পাঠন এবং পাঠক্রম বিষয়ক নানা কর্মসূচীর পাশাপাশি অধ্যাপক সমিতি বিগত একবছরে ও সর্বদাই ব্যস্ত থেকেছে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য মোকাবিলায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহিরাগতদের অবাধ আনাগোনা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মানহানি ও শারীরিক নিগ্রহের যে নিকৃষ্ট সংস্কৃতি এরাজ্যে একদশক ধরে চলেছে তা আজও অব্যাহত। গত ২৪শে জুলাই কোন্নগরে নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে ছাত্র সংসদের ছেলেদের হাতে নৃশংসভাবে আক্রান্ত হন।

গত ২৬শে জুলাই পুনরায় সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ মত বর্ধিত বেতন অবিলম্বে চালু, পার্ট টাইম, কন্ট্রাকচুয়াল শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের সুনির্দিষ্ট বেতনক্রম ঘোষণা, পাশাপাশি অতিথি অধ্যাপকদের জন্য সম্মানজনক চাকরির শর্ত প্রণয়ন এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের জন্য সপ্তম বেতনক্রমের সুপারিশ অনুযায়ী পেনশন চালুর দাবিতে বিকাশ ভবনের অদূরে টানা ছয় ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সামিল হয় অধ্যাপক সমিতি।

শিক্ষক দিবসে পথে নেমেছেন রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। শিক্ষকদের উপরে পুলিশি আক্রমণ বন্ধ, সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন, চুক্তিভিত্তিক ও আংশিক সময়ের শিক্ষক-সহ চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিকদের জন্য নির্দিষ্ট শর্ত চালুর দাবিতে ৫ সেপ্টেম্বর অধ্যাপক সমিতি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত মিছিল করে।

সপ্তম বেতনক্রম সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে বহরমপুর সম্মেলনের পর ২০১৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর অধ্যাপক সমিতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। এই প্রতিবেদন লেখা অবধি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সর্বশেষ বৈঠকটি হয় ২৫ অক্টোবর, ২০১৯। ঐদিন শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং অধ্যাপক সমিতির নেতৃত্বকে ডেকে পাঠান। অন্যান্য আর ও কয়েকটি শিক্ষক সংগঠনের উপস্থিতিতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সেই দিনও সপ্তম বেতনক্রম নিয়ে আশাব্যঞ্জক কোনো কথা শোনাতে পারেন নি। এর পর অধ্যাপক সমিতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে সপ্তম বেতনক্রম লাগু করার আবেদন জানায়। এই ঘটনাক্রমের অব্যবহিত পরে মুখ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, অধ্যক্ষ, উপাচার্যদের সঙ্গে ৫ নভেম্বর নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মিলিত হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এই সভায় অধ্যাপক সমিতিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ঃ ২০১১ সালে পালাবদলের পর থেকে রাজ্যের শাসক দলের মদতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলিতে নৈরাজ্য সৃষ্টির যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল আজ ও তা অব্যাহত আছে। শুরু থেকে শাসকদল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দলতন্ত্র কায়েম করার জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সিনেট/সিন্ডিকেট, কোর্ট/কাউন্সিলগুলি ভেঙ্গে দিয়ে পুরোপুরি মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ছিল শাসকদলের লক্ষ্য। তাই আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিধি বা Statute সংশোধন করার আদৌ কোনো সদিচ্ছা সরকার প্রকাশ করেনি। প্রথমদিকে মাঝে মধ্যে অভিন্ন বিধি বা Uniform Statute-এর কথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মুখে শোনা গেলেও এখন আর সেটুকু শোনা যাচ্ছে না। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিধিসম্মত প্রতিষ্ঠান না থাকায় মনোনীত শিক্ষা প্রশাসনিক বডিগুলি বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের মতামত ছাড়াই একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। বর্তমান সরকারের শিক্ষা ভাবনা চূড়ান্তভাবে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল, শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থ বিরোধী এবং স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বিরোধী। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন ও গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলুক—এটা সরকারের অগ্রাধিকারে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক পদ খালি থাকলেও শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পঠন-পাঠন গবেষণায়। সরকার নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় যতটা আগ্রহী শিক্ষা পরিকাঠামো, সুষ্ঠু পঠন-পাঠন ও গবেষণার মানের প্রতি ততটা আন্তরিক নয়।

বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার মুখে সুষ্ঠু পঠন-পাঠন, গবেষণা ও শিক্ষার উৎকর্ষ বা মানোন্নয়নের কথা বললেও শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত সরকারি পদক্ষেপগুলিতে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। ২০১৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষা (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন হল সেই আইন, যে আইন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বিরোধী। যে আইন চূড়ান্তভাবে অগণতান্ত্রিক ও শিক্ষার সাথে জড়িত সকলের স্বার্থ বিরোধী। একই ভাবে কেন্দ্রের নতুন শিক্ষানীতির (২০১৯) লক্ষ্য হল শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, শিক্ষায় বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণকে প্রসারিত করা, শিক্ষায় গরীব ও প্রান্তিক মানুষের সামাজিক বিযুক্তিকরণ (Social Exclusion) এবং সাম্প্রদায়িকতা ও গেরুয়াকরণকে সুনিশ্চিত করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য বিরোধী এই শিক্ষা নীতিতে গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষক সহ সকলের স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি যেভাবে শিক্ষা কাঠামোর খোলনলচে বদলে দিয়ে পশ্চিমী শিক্ষা কাঠামোকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে তাতে শিক্ষামহল সহ সমাজের অন্যান্য অংশও ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে শুধু শিক্ষক নয়, শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই শিক্ষা ব্যবস্থায় এক গুরুতর আক্রমণ নামিয়ে চলেছে। ফলে শিক্ষার সাথে যুক্ত বিশেষ করে সরকারের এই ভাবনাচিন্তার বিরোধী শিক্ষককুলকে একদম বন্ধ পরিবেশে শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। রাজ্য জুড়ে ছাত্রভর্তি, শিক্ষকদের পদোন্নতি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ কেন্দ্র করে ব্যাপক দুর্নীতি, দলবাজি, তোলাবাজি প্রভৃতি ভীষণভাবে বাস্তব। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতিপূর্ণ নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন এক অসুস্থ অগণতান্ত্রিক বাতাবরণ বিরাজ করছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা হল ঃ

রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক মতামত ছাড়াই ঐতিহ্যমণ্ডিত দ্বারভাঙা হল ভেঙে ফেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া চলছে। যেভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক সৌন্দর্যায়ন প্রক্রিয়া চলছে তাতে নয়ছয়ের সম্ভাবনা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। তবে শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফলে অতি সম্প্রতি খণ্ডিত ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠন করা গেছে। শিক্ষকদের চাপের ফলে সরকারের স্বাস্থ্য স্কীম কার্যকরী করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা গেছে। নির্বাচিত সিনেট/সিণ্ডিকেট ও ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠনের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত আছে। সংশোধিত UGC Pay Scale-এর দাবি জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে শিক্ষার উৎকর্ষকেন্দ্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি বহিরাগত অশুভ শক্তির দ্বারা নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টাকে ছাত্র শিক্ষকের যৌথ উদ্যোগে প্রতিহত করা গেছে। গত এক বছরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং বিধিসম্মত স্ট্যাটুট ও গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা এবং নতুন Pay Scale চালুর দাবিতে একদিনের কর্ম বিরতি এবং একাধিক ধর্ণা অবস্থান সংগঠিত হয়েছে। উপরোক্ত দাবিতে ক্যাম্পাসের ভিতরে শিক্ষকদের মিটিং-মিছিল হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জুটার নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষকে একাধিক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। সংশোধিত UGC Pay Scale-এর দাবি জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বারবার সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। শাসকদলের বেআইনী ছাত্রসংসদের ধারাবাহিক হেনস্থা ও ভূগোল বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান সরস্বতী কেরকেট্টা ও অন্যান্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জাতিগত বিদ্বেষ ও নিগ্রহের প্রতিবাদে বেশ কয়েকজন বিভাগীয় প্রধান ও সেন্টার অধিকর্তার পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মন্ত্রীমহাশয় ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং এক মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও তদন্ত রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করতে পারেননি। বিগত সম্মেলনের পর থেকে নির্বাচিত কোর্ট কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠন এবং শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে মাননীয় উপাচার্যের কাছে একাধিক ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে মিছিল সংগঠিত হয়েছে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের কারণে এমনকি ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলও গঠন করা সম্ভব হয়নি। সংশোধিত UGC Pay Scale-এর দাবি জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এক সরকারি আদেশনামায় চারুকলা অনুষদের Accompanist Teacher-দের শিক্ষক মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষকরা হাইকোর্টে যে মামলা করেছিলেন সেই মামলায় Accompanist Teacher-রা জয়লাভ করলেও আজও তাদের শিক্ষক মর্যাদা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুরো সুবিচার পায়নি।

অতি সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আন্দোলন খবরের শিরোনামে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বজনপোষণ, পূর্ণকালীন ও আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, শিক্ষকদের অন্ধকারে রেখে DST-PURSE, RUSA প্রভৃতি প্রকল্প থেকে অর্থের খরচ, অন্যান্য ক্ষেত্রে আর্থিক নয়ছয় এবং সর্বোপরি বায়োমেট্রিক উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদে শিক্ষকরা আন্দোলনে ফেটে পড়ে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই আন্দোলনের প্রতি কলকাতা, যাদবপুর,

রবীন্দ্রভারতী, বিশ্বভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীরাও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেন। তারপরেও কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অংশের শিক্ষক বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের পদ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কমিটির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ বায়োমেট্রিক উপস্থিতির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময়ে একটা ভয়ের পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা অব্যাহত আছে। কর্তৃপক্ষের অপছন্দের লোকজনকে খেয়াল খুশিমতো যত্রতত্র বদলি করে দেওয়া হচ্ছে। এই ভয়ভীতির পরিবেশের মধ্যে ও বিধিসম্মত গণতান্ত্রিক পরিচালন কমিটি গঠনের দাবিতে এবং বায়োমেট্রিক উপস্থিতির প্রতিবাদে অধ্যাপকদের আন্দোলন অব্যাহত আছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অন্ধকারে রেখে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু করার প্রতিবাদে সমস্ত শিক্ষকদের স্বাক্ষরসহ মাননীয় উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৫ দিনের মধ্যে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি প্রত্যাহার করা নাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক কাজকর্মে পুরোপুরি অসহযোগিতা করা হবে। শাসকদলের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক বিজ্ঞান সচিবকে হেনস্থা করার প্রতিবাদে শিক্ষকরা ক্যাম্পাসের ভিতর মিছিল সংগঠিত করেছেন এবং নিন্দাসূচক প্রতিবাদ পত্র মাননীয় উপাচার্যের কাছে পেশ করেছেন। সংশোধিত UGC Pay Scale-এর দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং এই দাবিতে শিক্ষকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের অবসরের বয়স ৬২ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছরের সরকারি আদেশনামা সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যকর করা হলেও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য ও প্রাণী বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও তা কার্যকর করা হয় নি। এছাড়া শিক্ষকদের জন্য তিনশত দিনের লিভ এনক্যাশমেন্ট সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা থেকে শিক্ষকরা আজও বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারের স্বাস্থ্য স্কিম লাগু করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নেন নি। গত চার বছরে কোনও শিক্ষকের CAS হয় নি। এছাড়া Statutory Body গুলির নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ একেবারে অনড় থাকায় পঠন-পাঠন ও ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা ও শিক্ষক স্বার্থে মাননীয় উপাচার্যের কাছে একাধিক বার ডেপুটেশন দেওয়া হলেও আজও কোন ইতি বাচক ফল পাওয়া যায় নি।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য ও প্রাণী বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অনুষদে ইউজি, পিজি ও পি.এইচ.ডি ইউনিফায়েড ক্যাম্পাসে চলছে না। একই ফ্যাকাল্টি দুটো ক্যাম্পাসে শিক্ষাদান করছে। ফলে শিক্ষাদান ব্যাহত হচ্ছে। CAS প্রমোশন সরকারি আদেশনামা থাকা সত্ত্বেও পছন্দের জনদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। সে কারণে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার গড়িমসি করার সুযোগ পাচ্ছে কর্তৃপক্ষের অপদার্থতার জন্য। সার্চ কমিটি ছাড়াই উপাচার্য নির্বাচন ও নিয়োগ হয়েছে চার বছর আগে। পুনরায় হতে যাচ্ছে বেআইনি ভাবে, যে কোনো ভাবে এই অসৎ উপায় বন্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে উচ্চ আদালতে একটি মামলা আছে। গত সেপ্টেম্বরে শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে সংরক্ষণ নীতিকে তোয়াক্কা না করে এবং অন্যান্য সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘন করে, উপযুক্ত নিয়ামক সংস্থার অনুমোদন ব্যতিরেকে। এ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বশংবদদের বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষকপদ খালি। শিক্ষকদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে প্রায় দীর্ঘ ৮/৯ বছর পর এই প্রথম শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং সার্চ কমিটি গঠনের পরও ডীন নির্বাচনের কাজ আজও হয়নি। বিভিন্ন বিভাগ ও ল্যাবগুলি চালাতে হচ্ছে কোন সহকারী ছাড়াই, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে পঠন-পাঠন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায়। ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলসহ অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলিতে নির্বাচিত পরিচালন ব্যবস্থার দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

পেনসনারদের সমস্যা ঃ কেন্দ্রীয় সরকার সপ্তম ইউ.জি.সি. পে রিভিউ কমিটির Recommendations-এর ভিত্তিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত অধ্যাপকদের সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষণা করলেও পেনশন সম্পর্কে কোনও উল্লেখ ছিল না। এর বিরুদ্ধে AIFUCTO এবং AIFRUCTO সম্মিলিতভাবে MHRD-র কাছে Pension Revision-এর আদেশনামা প্রকাশের দাবি জানিয়েছে। অবশেষে ১১ই জুন, ২০১৮ MHRD কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির অধ্যাপকদের জন্য Pension Revision-এর আদেশনামা প্রকাশ করে এবং এই আদেশনামার কপি সমস্ত রাজ্য সরকারের Principal Secretary, Department of Higher Education-এর কাছে forward করে। এই আদেশনামা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ২০শে জুন, ২০১৮ আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, উচ্চশিক্ষা দপ্তর, প্রধান সচিব, অর্থ দপ্তর এবং ডি.পি.আই., পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আদেশনামার কপি দিয়ে, এই আদেশনামার ভিত্তিতে Pension-এর দাবি জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয় এবং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এবিষয়ে তাঁর হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানানো হয়। একই সঙ্গে অর্থমন্ত্রীকে Pension Revision-এর উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করা ছাড়াও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, শিক্ষা দপ্তর, প্রধান সচিব, অর্থদপ্তর এবং ডি.পি.আই., পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চিঠি দিয়ে Pension Revision-এ উদ্যোগী হতে এবং সমিতির সঙ্গে আলোচনার জন্য সময় দিতে অনুরোধ করা হয়। ইতোমধ্যে WBCUTA-র পক্ষ থেকে গত নভেম্বরের শেষ প্রথম সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি Deputation দেওয়া হয়। সেই ডেপুটেশনে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল 7th UGC Pay Review Committee-র Recommendations অনুযায়ী যে Revision of Pay Scale এবং Pension-এর আদেশনামা প্রকাশ করেছে, তা আমাদের রাজ্যে কার্যকরী করা। আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, Pay Scale Revision-এর জন্য শিক্ষাদপ্তর থেকে Recommend করে অর্থদপ্তরে প্রস্তাব পাঠামো হয়েছিল এবং অর্থদপ্তর সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে এবং যেহেতু Pay Scale Revision হয়নি, Pension Revisionও সম্ভব নয়। অথচ আমরা জানি, ভারতে বেশ কয়েকটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশনামার Second Formulation অনুযায়ী পেনশন Revision হয়েছে বা আদেশনামা বেরিয়েছে। First Formulation-এর জন্য যে Concordance Table অধ্যাপকদের জন্য MHRD-র প্রকাশ করার কথা, তা এখনও বেরোয়নি। সুতরাং First Formulation অনুযাযী Pension Revision সম্ভব নয়। যে রাজ্যগুলিতে এই Revision হয়েছে তা হল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম সহ আরও কয়েকটি রাজ্যে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে যেখানে অতীতে প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় আদেশনামা কার্যকরী হত, সেখানে এখনও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন সদর্থক পদক্ষেপই নেওয়া হচ্ছে না।

WBCUTA-র কর্মসমিতি গত ১৬ ফেব্রুয়ারী তাঁদের সভায় ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ কলেজে কলেজে মূলত- চারটি দাবিতে 'দাবি ব্যাজ ধারণের সিদ্ধান্ত নেয়। দাবি চারটি হল ঃ ১) Revision of Pay Scales of College & University teachers ২) Revision of Pay of Whole Time Contractural and Part-time teachers ৩) Respectable, Dignified Service Condition and Honorarium to Guest Lecturer ৪) Revision of Pension and Gratuity। ১৫ মার্চ ২০১৯ সল্টলেকের আচার্য সদনে জমায়েত হয়ে বিকাশভবন অভিযানে WBCURTWA-ও সামিল হয়।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা সরকারের কাছে কয়েকটি দাবি জানিয়ে আসছি, যার সুযোগ শুধু সরকারী কর্মচারী বা সরকারী কলেজ শিক্ষকরা নন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক কর্মচারী সহ অন্যান্য সকল পেনশনাররা পান। শুধু তাই নয়, এগুলি অত্যন্ত মানবিক এবং স্পর্শকাতর। শুধু বেসরকারী কলেজ-শিক্ষকরা এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এগুলি হল (i) Handicapped Sons / Daughters-দের ক্ষেত্রে এবং Unmarried / Widowed / Divorced daughter-দের ক্ষেত্রে Family Pension-এর সুযোগ। এছাড়া Family Pension সংক্রান্ত আর একটি বিষয়েও আমরা দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে আসছি। সেটি হল অধ্যাপক/অধ্যাপিকাদের মৃত্যুর পর ৭ বৎসর বা ৬৭ বৎসর বয়স,

যেটি আগে হবে, সেই পর্যন্ত Enhanced Family Pension-এর সুযোগ যা অন্যান্য সব ধরণের পেনশনাররা পান, যা আদালতের রায় অনুযায়ী আমাদের প্রাপ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এগুলি সম্পর্কে কোন সুরাহা হোল না। আমাদের আর একটি দাবি সম্পর্কেও সরকার নীরব। সেটি হল, কর্মরত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মত অবসরপ্রাপ্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদেরও West Bengal Health Scheme-এ অর্ন্তভুক্ত করা। আবারও আমরা সরকারের কাছে এই দাবি জানাচ্ছি।

গত সম্মেলনে আমরা জানিয়েছিলাম, ১-১-২০০৬ পূর্ববর্তী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষদের ১-১-২০০৬-এ কর্মরত অধ্যক্ষদের নতুন বেতনক্রমে সর্বনিম্ন বেতনে Pay Fixaiton-এর ভিত্তিতে পেনশন Revision-এর নতুন আদেশনামা বেরিয়েছে যেখানে সর্বনিম্ন পেনশন ২৩৭০০-এর পরিবর্তে হবে ২৬৬৯৫। এই আদেশনামা প্রকাশের পর A.G. West Bengal থেকে সমস্ত Pension Disbursing Authority-কে এই আদেশনামা Implementation-এর দায়িত্ব দিয়ে circular দেওয়া হয়। Director Treasuries-এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত Treasury-কে এই মর্মে Circular দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন Treasury নানা অজুহাতে Pension Revision করতে বিলম্ব করছেন বা Arrear দিতে দেরী করছেন। যারা কলকাতার ব্যাঙ্ক থেকে পেনশন পান, প্রথমদিকে কিছু সমস্যা হলেও পরবর্তীতে A.G. West Bengal Office-এর সহযোগিতায় সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন Treasury থেকে যারা পেনশন পান, তাঁদের অনেকের এখনও সমস্যার সমাধান হয়নি। Director of Treasuries-এর সাহায্য নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

গত সম্মেলনে আর একটি বিষয়েও আংশিক উন্নতির কথা জানিয়েছিলাম সেটি হল ১-১-২০০৬ পরবর্তী কলেজ শিক্ষক পেনশনারদের মধ্যে যারা ৩১-৩-২০০৯-এর মধ্যে অবসর নিয়েছেন, তাঁদের Refused Leave (৩১-৭-২০০৬ এর মধ্যে যারা অবসর নিয়েছেন) বা Leave Encashment (১-৮-২০০৬-এর পরে অবসর নিয়েছেন) তাঁরা নতুন বেতনক্রমের ভিত্তিতে এই টাকা পাননি। ২০১৬ সালে কয়েকটি কলেজের কয়েকজন অধ্যাপককে Finance Department-এর অনুমোদনের ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৭ সালে কয়েকটি কলেজের শিকদের নাম করে এই টাকা দেওয়ার আদেশনামা বেরোয়। কিন্তু বর্তমানে তা দেওয়া বন্ধ আছে। আমরা অবিলম্বে এই অর্থ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

বন্ধুগণ, গত সম্মেলনে আরা জানিয়েছিলাম, বেসরকারী ও সরকারী কলেজ শিক্ষক পেনশনাররা ১-১-২০০৬ থেকে Pension Revision-এর সুযোগ পেলেও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি এবং এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া হবে। গত জুন মাসের শেষে এই বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আমাদের দাবিসমূহ ঃ

১। 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট ২০১৭' বাতিল করতে হবে।

২। CBCS বাতিল করতে হবে।

৩। UGC-র সুপারিশ অনুযায়ী ১/১/২০১৬ থেকে সপ্তম বেতন কমিশন দ্রুত কার্যকর করতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের বর্ধিত বেতন অনুসারে পেনশন দিতে হবে। ইউজিসি রেগুলেশন-এর চতুর্থ সংশোধনীর বাহানায় বন্ধ হয়ে থাকা যাবতীয় পদোন্নতির ফাইল দ্রুত ছাড়তে হবে।

৪। আংশিক, চুক্তিভিত্তিক ও অতিথি শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের Seniority বজায় রেখে নির্দিষ্ট বেতন ও ছুটিসহ অন্যান্য চাকুরির শর্তাবলি নির্দিষ্ট করতে হবে ও মর্যাদার সঙ্গে কাজের সুযোগ দিতে হবে। সম কাজে সম বেতন নীতি মেনে এঁদের যাবতীয় সুবিধা দিতে হবে।

৫। 'আর. টি. ই. অ্যাক্ট ২০১৯' সংশোধন বাতিল করতে হবে এবং সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। রাজ্যে বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম, মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বাড়িয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষম আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। দেশজুড়ে ইতিহাস চর্চার বিকৃতি রোধ ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতির প্রসারে সমিতির নেতৃত্ব শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৭। শিক্ষার বহমনতায় সরকারি ব্যয়ে সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার গুরুত্ব অপরিসীম। সরকারি ব্যয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি কলেজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা বন্ধ করতে হবে। নতুন করে Self Financing Course চালু করা যাবে না। রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয় সরকারকেই এবিষয়ে তাদের দায়বদ্ধতা সচেতন হয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮। অবিলম্বে সকল শূন্যপদে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের স্থায়ী নিয়োগ করতে হবে। সর্বস্তরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে। সিএসসি, টেট, এস এস সি, পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯। চাকুরিরত অবস্থায় কোনো শিক্ষকের মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারের একজনকে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিতে হবে।

১০। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় Cashless Health Scheme-এর সুনির্দিষ্ট G.O. বার করতে হবে।

১১। রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অ্যাডহক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কোর্ট-কাউন্সিল, সিনেট/সিণ্ডিকেট বাতিল করে সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয়-আইন অনুযায়ী তা দ্রুত গঠন করতে হবে। অবিলম্বে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট সংশোধন করতে হবে এবং তদনুযায়ী পিজি/ইউজি/ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল, বোর্ড অব স্টাডিজ গঠন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে উপাচার্য ও অন্যান্য আধিকারিক পদে দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি গণতন্ত্রসম্মত। এই পদ্ধতি মেনে চলা হোক। অবিলম্বে সংশোধিত বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে।

১৩। Family Pension-র ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় Physically and visually Challenged dependents, অবিবাহিতা এবং বিবাহ বিচ্ছিন্না কন্যাদের সুবিধা প্রদান করার নির্দিষ্ট সরকারি আদেশনামা বের করতে হবে।

১৪। অসংখ্য কলেজের পরিচালন কমিটি শিক্ষকদের প্রমোশন ও এরিয়ার বিষয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছেন। এই বিষয়ে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার দাবি করা হচ্ছে।

১৫। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বকেয়া এরিয়ারটি অবিলম্বে দেওয়া হোক। GTA-র অন্তর্গত কলেজের শিক্ষকদের এযাবৎ অপ্রাপ্ত শেষ বকেয়াটিও দ্রুত দিতে হবে।

১৬। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য ও প্রাণী বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধুদের অবসরের বয়ঃসীমা ১/১/২০১৯ থেকে ৬৫ বছর করতে হবে।

১৭। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকপদ সৃষ্টি করতে হবে।

WBCUTA জিন্দাবাদ।

AIFUCTO জিন্দাবাদ।

শিক্ষক ঐক্য জিন্দাবাদ।

শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মী ঐক্য জিন্দাবাদ।